ক্রুসেড-২০.
পাল্টা ধাওয়া
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন

ক্রুসেড - ২০

পাল্টা ধাওয়া

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

ক্রুসেড - ২০

পাল্টা ধাওয়া

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৫
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস
মূল্যঃ ৫০.০০
CRUSADE-20
Palta thaowa
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
Published on: October 200
2nd Edition: April 2005
PRICE : 50.00
ISBN 984-581-238-4

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল।
কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়,
কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।
ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর শহর-গ্রামে।
একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

✖ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✖ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ✖ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✖ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✖ ভয়াল রজনী ✖ আবারো সংঘাত ✖ দুর্গ পতন ✖ ফেরাউনের গুপ্তধন ✖ উপকূলে সংঘর্ষ ✖ সর্প কেল্লার খুনী ✖ চারদিকে চক্রান্ত ✖ গোপন বিদ্রোহী ✖ পাপের ফল ✖ তুমুল লড়াই ✖ উমরু দরবেশ ✖ টার্গেট ফিলিস্তিন ✖ গাদ্দার ✖ বিষাক্ত ছোবল ✖ খুনী চক্রের আস্তানায় ✖ পাল্টা ধাওয়া

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২১

ধাপ্পাবাজ

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।
তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ— 'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের পাঁচটি বই

আতংকিত নানকিং ✖ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ✖
ব্ল্যাক আর্মির কবলে ✖ হাইনান দ্বীপে অভিযান ✖
অশান্ত চীন সাগর

অচিরেই বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের পরবর্তী বই

বিধ্বস্ত শহর

ত্রিপলীর খৃস্টান রাজ দরবার। বিভিন্ন খৃস্টান সম্রাটরা এসে এখানে মিলিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে একটি সমন্বিত ও সর্বপ্লাবী হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা। মুসলমানদের ওপর চূড়ান্ত হামলার লক্ষ্যেই এ সম্মেলন। সম্মেলনে অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করছে দুই বিশ্বস্ত খৃস্টান, ভিক্টর ও চেঙ্গিস।

রাজকীয় উর্দি পরে দু'জনই মেহমানদের সামনে ঘোরাফেরা করছিল। এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছিল তাদের। মেহমানদের অনেকেই এদের আগে থেকে চেনে। ওরা মেহমানদের বিশ্বাসভাজন তো বটেই, কারো কারো প্রিয়ভাজনও।

ক্রুসেডদের গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান হরমন। তিনিই অনেক যাচাই-বাছাই করে ওদেরকে এ চাকরীতে নিয়োগ দিয়েছেন। কিন্তু আসলে এরা দু'জনই ছিল সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা। গোয়েন্দা হিসাবে তারা দু'জনই ছিল চৌকস। অসম্ভব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ না হলে হরমনের মত উস্তাদ গোয়েন্দার সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তাদের পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না।

দেখতে শুনতেও দু'জনই ছিল স্মার্ট। এখানে তাদের চাকরী হওয়ার এটাও একটা কারণ যে, তাদের উভয়েরই চেহারা সুন্দর, দেহ কাঠামো সুঠাম, সবল ও পৌরুষদীপ্ত। রাজকীয় মেহমানখানায় কাজ করার উপযুক্তই বটে।

ভিক্টর তার প্রকৃত নামেই সবার কাছে পরিচিত। কারণ সে আসলেই খৃস্টান। রাশেদ চেঙ্গিস ছিল তুরস্কের নাগরিক, মুসলমান। খৃস্টানদের কাছে সে তার নিজের দেয়া খৃস্টান ছদ্মনামে পরিচিতি ছিল। এ জন্য কোন খৃস্টানই তার আসল নাম জানতো না এবং সে যে মুসলমান তাও জানতো না।

গভীর রাত পর্যন্ত চলল সম্মেলনের কাজ। আহারাদি, মদপান ও আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে রাত পার করে দিল সম্রাটগণ। বিশ্বস্ত খাদেমের মতই হাসি মুখে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সেবা করে যাচ্ছিল।

মাঝ রাতের পর মিটিং শেষ হলো। তখন তারা ছুটি পেল নিজ নিজ কামরায় যাওয়ার।

'আমরা দু'জন একই সাথে চাকরী ও ডিউটিতে অনুপস্থিত থাকতে পারি না।' ভিক্টর বললো, 'এ সংবাদ অন্য কাউকে দিয়ে কায়রো পাঠাতে হবে। এমন বিশ্বস্ত লোক কাকে পাওয়া যায় বলতো?'

'ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলতে হবে।' রাশেদ চেঙ্গিস বললো, 'তিনি ভাল বলতে পারবেন, কে দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে এ সংবাদ কায়রো পৌছাতে পারবে। তবে যেই যাক, তাকে বিশ্বস্ত হতে হবে।' সে আরো বলল, 'আমি আজই এ সংবাদ দিয়ে কাউকে পাঠানোর দরকার মনে করছি না। এখনো খৃস্টান সম্রাটরা যুদ্ধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেনি। যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিকল্পনা ও পরিপূর্ণ তথ্য নিয়েই কায়রোতে

লোক পাঠানো দরকার। অসম্পূর্ণ সংবাদ দিয়ে সুলতান আইয়ুবীকে হয়রান পেরেশান করার কোন মানে নেই।'

'না, আমি এটুকুকেই অনেক বড় খবর মনে করি। ইমাম সাহেবকে বলা দরকার, ক্রুসেড বাহিনী বিশাল শক্তি নিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। যাতে তিনি এ খবর কায়রো পৌঁছে দিতে পারেন।' ভিক্টর বললো, 'সুলতান আইয়ুবী এতে করে প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পাবেন। এখনো যেসব দিকে তাঁর দুর্বলতা রয়েছে দ্রুত তা সংশোধন করে নিতে পারবেন। অভাবগুলো দ্রুত পূরণের জন্য সচেষ্ট হতে পারবেন। পরে যখন বিস্তারিত পরিকল্পনা পাবো তখন সে খবরও পাঠাবো।'

'কিন্তু বার বার যাতায়াত করলে হরমনের গুপ্তচরদের নজরে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে!'

'আর এমন যদি হয়, কোন খবর পাঠানোর আগেই আমরা ধরা পড়ে গেলাম!'

'কেন, তোমার কি নিজের প্রতি আস্থা নেই?'

'নিজের প্রতি আস্থা আমার ঠিকই আছে, কিন্তু তোমার প্রতি নেই। শোনো!' ভিক্টর চেঙ্গিসকে বললো, 'যে সময় মেহমানরা আক্রমণের কথা বলছিল, তখন আমি তোমাকে লক্ষ্য করে দেখেছি। তুমি মদের পিয়ালা সম্রাট রিমাণ্ডের সামনে সাজিয়ে রাখতে রাখতে একবার থেমে গিয়েছিলে। তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তুমি তার কথার দিকে খেয়াল করছো। আমি তোমার চেহারা দেখছিলাম। খবরটি শুনে তোমার চেহারায় প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠেছিল। আমি জানতাম, এত দামী তথ্য

পাওয়ার পর আতংক বা খুশীর ভাব ফুটে উঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার ভুলে গেলে চলবে না, হরমনও এখানে উপস্থিত আছেন। হরমন আলী বিন সুফিয়ানের সম পর্যায়ের গোয়েন্দা। আমি তোমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে হরমনের দিকেও তাকিয়েছিলাম। আমার তখন আশংকা হলো, তিনি তোমাকে লক্ষ্য করছেন। তাই তো বলছি, ভাই, আমাদের নিঃশ্বাসের কোন বিশ্বাস নেই।'

'হরমনের কাছে আমি কোন অপরিচিত লোক নই।' রাশেদ চেঙ্গিস বললো, 'আমার সম্পর্কে তিনি সন্দেহ অনেক আগেই শেষ করেছেন। এখন ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'ভয় করার কথা বলছি না, সাবধান হওয়ার কথা বলছি।' ভিক্টর বললো, 'আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমরা শত্রুর পেটের মধ্যে বাস করছি।'

'তা ঠিক। কিন্তু ভাই, যাই বলো, আমিও তো একজন মানুষ। মানবিক ত্রুটিবিচ্যুতির উর্ধে কি করে উঠি!'

'সে জন্যই তো তোমাকে সাবধান করছি। তুমি তো জানো না আজ হরমনের ওপর কি নির্দেশ জারী করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতিটি মানুষকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার জন্য বলা হয়েছে তাকে। আর তাকে এই ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তিনি যা ভাল মনে করবেন, সেটাই আইন। তিনি কাউকে সন্দেহ করলে এবং সেই সন্দেহের বশে কাউকে খুন করলেও কেউ তার কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারবে না।'

'বলো কি! এ ব্যাপারে তার হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, শোন, এসব কথা এখন থাক। আগে কাজের কথায় আসি। তুমি এখনি সোজা মসজিদে চলে যাও। সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে। এই সুযোগে আজকের আলোচনা ইমাম সাহেবকে বিস্তারিত জানিয়ে এসো। যদি কায়রোতে যাওয়ার মত লোক পাওয়া যায়, তবে যেন দ্রুত তাকে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর যদি ওদিক থেকে কেউ এসে থাকে, তবে আমার সাথে দেখা না করে যেন ফিরে না যায়।'

শহরের এক মসজিদের ইমাম সুলতান আইয়ুবীর গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরিণত হয়েছেন। সেই সুবাদে মসজিদটিও মুসলিম গোয়েন্দাদের গোপন আড্ডায় পরিণত হয়েছে। আলী বিন সুফিয়ানের কোন গোয়েন্দা গোপন কোন খবর পেলে মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবকে সে তথ্য দিয়ে আসে। ইমাম সাহেব আবার সে খবর অন্য গোয়েন্দা মারফত জায়গা মত পৌঁছে দেন।

ভিক্টর কখনও মসজিদে যায় না। সে বলে, 'আমি মুসলমানও না, নামাজ-কালামও জানি না। আর মসজিদের ইজ্জত-সম্মান বিষয়েও কোন জ্ঞান নেই আমার। আমি কেন মসজিদে যাবো?'

তার এ কথা যেমন খাঁটি, তারচে বেশী খাঁটি, সে এক হুশিয়ার গোয়েন্দা। অযথা মসজিদে যাওয়ার ঝুঁকি সে কেন

নিতে যাবে! মসজিদে মুসল্লী বেশে ক্রুসেড গোয়েন্দা নেই, এমন তো নয়। অনেক মুসল্লীই আছে, যারা পাকা গোয়েন্দা। তারা খৃস্টানদের চর হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তারা মসজিদের মুসল্লীদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে এবং তাদের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে। এ জন্যই দেখা যায়, আইয়ুবীর প্রতি সামান্য দরদ রাখে এমন বেশীর ভাগ মুসলমানই গ্রেফতার হয়ে যায়।

রাশেদ চেঙ্গিসও দিনের বেলা এবং প্রকাশ্যে কখনো মসজিদে যায় না। কারণ সে নিজেও খৃস্টান পরিচয়েই সবার কাছে পরিচিত। কোন খৃস্টান মসজিদে গেলে প্রথম দর্শনেই সে সন্দেহভাজনদের তালিকায় পড়ে যাবে। যে লোক খৃস্টান রাজসভায় মদ পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে, মসজিদের তার কি দরকার? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর সে দিতে পারবে না। তাই যখনি প্রয়োজন পড়ে, তখন গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে ইমামের সাথে দেখা করতে যায়।

ইমাম সাহেবের কামরা মসজিদের সাথে লাগোয়া। কামরার দরজা মসজিদের বারান্দার দিকে। বারান্দা দিয়ে উঠে দরজায় ধাক্কা দিলে দেখা যাবে, দরজাটি ভেতর থেকে ভেজানো বা আটকানো। তখন নিয়ম মাফিক সাংকেতিক টোকা দিতে পারলেই সে দরজা খুলে যাবে।

০

রাশেদ চেঙ্গিস তার পোষাক পরিবর্তন করলো। গায়ে জোব্বা

ও মাথায় পাগড়ী বেঁধে নিল। মুখে কৃত্রিম দাড়িও লাগাল। এরপর কামরা থেকে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। আদেশ অনুযায়ী তাকে সব সময় ক্লীন সেভ থাকতে হয়। গোপন মিশনে যাওয়ার সময় সে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে বের হয়, যাতে কারো চোখে পড়লেও সহজে ধরা না পড়ে।

একজন পাক্কা হুজুর সেজে রাস্তায় নামে সে। রাজ দরবারের বাইরে তাদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট কোয়ার্টার আছে। সেখানেই থাকে সে এবং ভিক্টর। তাই বেরোতে কোন অসুবিধা হয়নি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাতি জ্বলছে। সে যতটা সম্ভব আলো এড়িয়ে পথ চলছিল।

রিমাণ্ডের পারিষদ এবং সেনা অফিসার ছাড়াও ওখানে জমায়েত হয়েছিল অনেক মেহমান। তারা বিভিন্ন খৃস্টান সাম্রাজ্যের সম্রাট বা সেনাপতি। সম্রাট রিনাল্ট, তার অনেক নাইট এবং অফিসারও সেখানে উপস্থিত ছিল। আরও ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনা কর্মকর্তাবৃন্দ।

এইসব সম্মানিত মেহমানদের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন সম্রাট রিমাণ্ড। আলাপ-আলোচনা ও যুদ্ধের পরিকল্পনায় যেটুকু সময় ব্যয় হতো তার বাইরে বাকী সময়টুকু তারা কাটিয়ে দিত আমোদ-স্ফূর্তি ও মাতলামী করে। অধিকাংশ রাত তারা পার করতো মদ ও মেয়ে নিয়ে। দরবারে ছিল অভিজাত শ্রেণীর পেশাদার নিশিকন্যাদের রমরমা ভাব। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররা মেতে উঠে স্ত্রী বদল খেলায়। ফলে রাতে শহর জুড়ে একটা উৎসব উৎসব

ভাব চলে এলো।
রাশেদ চেঙ্গিস তার কামরা থেকে বেরিয়ে পথে নেমেই বিপাকে পড়ল। কোথায় সে একটু নিরিবিলিতে পথ চলবে, গোপনে দেখা করবে ইমাম সাহেবের সাথে, তা নয়, পথ ভর্তি লোকজন। পথের পাশে বিভিন্ন দেশের সৈনিকরা তাঁবু টানিয়ে নিয়েছে। সেই সব তাঁবুতে, এমনকি পথের মধ্যেও অসভ্যপনা চলছিল। বেসামাল মাতাল জোড়া এমন ভাবে পথ চলছে, যেন ওটা ওদের ড্রয়িং রুম।
সে এই সব জুটির দৃষ্টি এড়িয়ে কৌশলে রাস্তা পার হয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত সে বিপদসীমা পার হয়ে শহরের সাধারণ আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করলো। একটু পর গিয়ে হাজির হলো সেই মসজিদের পাশে।
মসজিদটি এক মুসলিম মহল্লার অভ্যন্তরে। এখানে কোন কৌলাহল ছিল না, আশেপাশে কেউ জেগে আছে বলেও মনে হলো না তার। সে বারান্দা পেরিয়ে ইমাম সাহেবের দরজায় গিয়ে হাজির হলো। এদিক-ওদিক ভাল ভাবে লক্ষ্য করে কামরায় প্রবেশ করতে যাবে, এমন সময় কারো আলতো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। থমকে দম আটকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল সে। শব্দটি গলি পেরিয়ে মসজিদের মোড়ের কাছে এসে নীরব হয়ে গেল।
রাশেদ চেঙ্গিস অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। আর কোন শব্দ নেই। সে ভাবল, তবে কি এটা মনের ধোঁকা? নাকি ভুল শুনলাম? সে বারান্দা দিয়ে হেঁটে আবার এসে গলি মুখে উঁকি

দিল। না, আশেপাশে কেউ নেই।
রাশেদ চেঙ্গিস ভাবলো, হয়তো কোন কুকুরের পদধ্বনি ছিল ওটা। সে তার মনকে শান্ত করে ইমাম সহেবের কামরার দরজায় ধাক্কা দিল। খুলে গেল দরোজা। রাশেদ চেঙ্গিস ভেতরে প্রবেশ করে ইমাম সাহেবকে সব কথা খুলে বলল।
'ক্রুসেড বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য এখানে জড়ো হয়েছে।' চেঙ্গিস বললো, 'সবচে বড় দলটি নিয়ে এসেছে সম্রাট রিনাল্ট। ত্রিপলীর সেনাবাহিনী আগে থেকেই এখানে আছে। অন্যান্য সম্রাটরাও তাদের বাহিনী এসে পৌঁছার জন্য অপেক্ষা করছে। কায়রোতে এ সংবাদ তাড়াতাড়ি পাঠানো দরকার। সৈন্য অভিযানের আগেই এ বার্তা সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের সম্বর্ধনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন।'
'তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এসেছো। আমি এ খবর কায়রো পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। তুমি আর কিছু বলবে?'
'আমরা যদি সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি, তবে অভিযানের আগেই কমাণ্ডো হামলা চালিয়ে এই বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা সম্ভব। বিষয়টি আপনি গভীরভাবে ভেবে দেখবেন। আর যদি এটা সম্ভব না হয় তবে তাদেরকে অভিযানের মাঝ পথে বাঁধা দেয়া যেতে পারে।'
'তোমার কথার অর্থ হচ্ছে, কমাণ্ডোদের বলতে হবে, তারা যেন শত্রুদের রসদপত্র পথেই জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।' ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি এ কাজ করাতে পারবো, কিন্তু

করাবো না। তুমি হয়তো শুনে থাকবে, যে সব অধিকৃত শহরে আমাদের কমাণ্ডো বাহিনী ক্রুসেড বাহিনীর ক্ষতি সাধন করেছে, সেখানে নিরীহ মুসলমানদের বস্তিগুলোর কি অবর্ণনীয় দুর্দশা হয়েছে। সে এলাকার মুসলমানদের জীবন জাহান্নামের মতই কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে। ক্রুসেড বাহিনী প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে অনুসন্ধান করেছে। আমাদের পর্দানশীন নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। আমাদের যুবতী মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। কিশোর ও যুবকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। বুড়োদেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে ওদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করাচ্ছে।

আমি বিষয়টি সুলতান আইয়ুবীকে জানিয়েছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছেন, 'মুসলমান নাগরিকদের জান ও মালের ক্ষতি হতে পারে এমন ভয় থাকলে সেই শহরে কমাণ্ডো অভিযান চালানো যাবে না। শত্রুদের খাদ্যসামগ্রী তাদের বাহিনীর সাথে আসতে থাকুক। সময়মত সেগুলোর ব্যবস্থা আমি করবো।'

'আমি আরো বিস্তারিত রিপোর্ট আপনাকে দু'চার দিনের মধ্যেই দিচ্ছি।' চেঙ্গিস বললো, 'আপনি এখন আরও বেশী সাবধান থাকবেন। এখানকার গোয়েন্দা সংস্থা খুব বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা এখন পশু-পাখীকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে।'

'ঠিক আছে, এ নিয়ে ভেবো না। তুমিও সাবধানে থেকো।' ইমাম সাহেব বললেন, 'আগামী কাল ভোরেই আমি কাউকে

কায়রো পাঠিয়ে দেবো।'
রাশেদ চেঙ্গিস মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো। এবার সে আর চোরের মত লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই গলি পথ ধরে হাঁটতে লাগল।
সে যেই রাস্তার মোড় ঘুরলো, তখন আবারও কারো পায়ের চাপা শব্দ শুনতে পেল। সে পিছন ফিরে তাকালো, অন্ধকার গলিপথে কাউকে দেখতে পেল না। তবে এবারের শব্দটা এত স্পষ্ট ছিল যে, এটা আর অমূলক ধারণা রইল না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে, এই সন্দেহ দৃঢ় তার বিশ্বাসে পরিণত হলো। সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পিছন ফিরে আবার গলিপথে ঢুকে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হলো। কিন্তু না, কাউকেই দেখা গেল না।
সে আবার ফিরতি পথ ধরলো এবং দ্রুত হেঁটে তার ঠিকানায় পৌঁছে গেল। কামরায় পৌঁছে সে তার কৃত্রিম দাড়ি খুলে পুরাতন কাপড়ের বাণ্ডিলে তা লুকিয়ে রাখলো। তারপর সে তার পোষাক পাল্টাল, যেমন পোষাক সাধারণত খৃস্টানরা পরিধান করে। এখন আর কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না।
ভিক্টর ও চেঙ্গিস চেষ্টা করছিল, ক্রুসেড বাহিনী কোথায় আক্রমণ চালাবে এবং তাদের অভিযানের ধরণ কি হবে তা জানার জন্য।
ত্রিপলীতে সেনা সমাবেশ বেড়েই চলছিল। গোয়েন্দাদের আনাগোনা এবং ছুটাছুটিও বেড়ে গিয়েছিল। এই দুই গোয়েন্দা

চোখ কান খোলা রেখে প্রত্যেকের গতিবিধি জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
সম্রাট রিমাণ্ডের দায়িত্ব ছিল মেহমানদের আতিথেয়তা করা। কারণ তার রাজধানীতেই এই সমাবেশ হচ্ছে।
এক রাতে তিনি সমস্ত খৃস্টান সম্রাট, উচ্চ সামরিক অফিসার ও অন্যান্য শাসকবৃন্দকে নৈশভোজের দাওয়াত দিলেন। এই রাতটি ছিল চেঙ্গিস ও ভিক্টরের জন্য অসম্ভব ব্যস্ততার রাত।
সম্রাট রিমাণ্ড মেহমানদেরকে উত্তম আপ্যায়ন ও দামী মদ পরিবেশনের জন্য হুকুম দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যস্ততা বেড়ে গেল।
তারা জানতো, এই ব্যস্ততা ও সতর্কতার প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ মেহমানরা সজ্ঞানে থাকে। মেহমানরা মদের নেশায় বিভোর হয়ে গেলে সেই সতর্কতার আর প্রয়োজন পড়ে না। তখন ভোজসভার কর্মচারীদের জন্য সৃষ্টি হয় সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগে অনেকেই দু'চার পেগ মদ সরিয়ে রাখে। পছন্দের খাবারটা একটু চেখে দেখে। আর কেউ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে রাজ-রাজরাদের লীলাখেলা ও অসভ্যতা।
এই ভোজ সভা ছিল নারী-পুরুষের অবাধ মিলনকেন্দ্র। তার মধ্যে যুবতী মেয়েরা যেমন ছিল, তেমনি ছিল যুবতী সাজা বৃদ্ধারাও।
ভিক্টর ও চেঙ্গিস উভয়েই খাবার ও মদ পরিবেশনের তদারকিতে খুবই ব্যস্ত ছিল। এক যুবতী রাশেদ চেঙ্গিসের কাছ থেকে দু'তিন বার মদ চেয়ে নিল। চেঙ্গিস প্রত্যেকবারই

কোন বয়কে ডেকে মদ দিতে বললো।
মেহমানরা অনেকেই সম্রাট রিমাণ্ডকে ঘিরে বসে বসে গল্প-গুজব করছিল। কেউ বসেছিল হলরুমের ভেতর, কেউ বারান্দার খোলামেলা পরিবেশে ছোট ছোট টেবিলে জুটি বেঁধে আলাপ করছিল। কেউ আবার নিরিবিলি পরিবেশ পাওয়ার আশায় বাগানে নেমে পড়েছিল।
যে যুবতী বার বার চেঙ্গিসের কাছে মদ চাচ্ছিল, আবারও সে হাত ইশারায় তাকে কাছে ডাকল। মেয়েটি ছিল খুবই সুন্দরী। চেঙ্গিস তার কাছে যেতেই সে বলল, 'আমি যতবার তোমার কাছে মদ চেয়েছি ততবারই তুমি বয়-বেয়ারা দিয়ে তা পাঠিয়ে দিয়েছো। এক যুবতীকে খুশী করার জন্য তুমি কি নিজের হাতে একবার পরিবেশন করতে পারো না?'
'জ্বী, কেন নয়।' চেঙ্গিস বিনয়ের হাসি হেসে বলল, 'আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।'
'উঁহু, এখানে নয়।' মেয়েটি মুচকি হেসে বললো, 'আমি বাগানে যাচ্ছি, ওখানে নিয়ে এসো।'
চেঙ্গিস মদের একটি সুন্দর সুরাহী ও পিয়ালা নিয়ে বাগানে চলে গেল। মেয়েটা আগেই ওখানে গিয়ে বসেছিল। রাজ প্রাসাদের আঙ্গিনায় চমৎকার সাজানো গুছানো বাগান। সেখানেও মেহমানরা জোড়ায় জোড়ায় বসে গল্প করছিল। সেই সাথে চলছিল সমানে পানাহার।
কিন্তু এই মেয়েটি বাগানের এক টেবিলে একাকীই বসেছিল। এতে চেঙ্গিস একটু বিস্মিত হলো। কারণ এখানে কেউ এ

নেই, সবাই ব্যস্ত আপন আপন সঙ্গীর সাথে। এতসব জুটির মাঝে তাকে বড় বেমানান লাগছিল।

এমন সুন্দরী ও যুবতী মেয়ের তো একা থাকার কথা নয়! ভাবল চেঙ্গিস, তার চারপাশে তো এতক্ষণে ভ্রমরের ভিড় লেগে যাওয়ার কথা! সে মেয়েটির পিয়ালায় মদ ঢালতে ঢালতে বললো, 'আপনার আর কিছু লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ।' মেয়েটি সৌজন্য প্রকাশ করে বলল, 'আমার আর যা লাগবে তা তুমি দিতে রাজি হবে কিনা তাই ভাবছি।'

আরো অবাক হলো চেঙ্গিস। জিজ্ঞেস করলো, 'বলুন, কি লাগবে আপনার?'

'দেখতেই পাচ্ছো আমি একা। তোমার সাথে একটু কথা বললে অসুবিধা আছে?'

বিনয়ের সাথে বললো চেঙ্গিস, 'না, না। বলুন কি জানতে চান?'

'তোমার দেশ কোথায়?'

সে ইউরোপের একটি অঞ্চলের নাম বললো।

'এখানে কতদিন আছো?'

'বলতে পারেন শিশুকাল থেকেই। আমার বাবা ছিলেন সম্রাট রিমাণ্ডের রাজ পরিবারের কর্মচারী। এখন আমি তার সামান্য গোলাম।'

'বাহ! তাহলে তো দেখছি, তুমি রাজ পরিবারেরই একজন! অন্তত এ রাজ পরিবারের যত কাহিনী তোমার জানা আছে, অনেকেরই তা নেই।'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন এ আমার পরম সৌভাগ্য।' বিনয়ের সাথে বলল চেঙ্গিস।
'তোমার এ সৌভাগ্যে সামান্য ভাগ বসানোর লোভ হচ্ছে। আমি কি তোমার কাজের ক্ষতি করছি?'
'না, না। আপনাদের সেবা করাই তো আমার কাজ! বলুন, কি বলবেন।'
'তাহলে তুমি আরো কিছুক্ষণ আমাকে সঙ্গ দাও।' মেয়েটি তার পিয়ালা চেঙ্গিসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নাও, তুমিও সামান্য পান করে নাও।'
'না, না। একি বলছেন আপনি! আমি আপনার সামান্য গোলাম মাত্র!' তার কণ্ঠ থেকে অকৃত্রিম বিস্ময় ও বিনয় ঝরে পড়ল, 'আপনি আমার মুনীবের মেহমান! একি করে সম্ভব!'
'রাখো তো ওসব কথা! এখানে তোমার সংকোচের কিছু নেই। আমি নিজেই তো তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।' মেয়েটির কণ্ঠে অন্তরঙ্গতা। সে পাত্রটি বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য না হয় তুমি সম্রাট হয়ে যাও, আর আমাকে তোমার দাসী মনে করো।' মেয়েটি তার হাত ধরে তৃষ্ণার্ত হাসি হেসে বলল, 'আমার চোখে তুমি এখন পরদেশী এক শাহজাদা! আর আমি এখানকার শাহজাদী! কই, নাও! ধরো তো এটা! আমার মেহমানকে আমি কিছু খেতে দেবো না!'
চেঙ্গিস বিব্রত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'আপনি এখানে একা কেন? আপনার সঙ্গী কোথায়?'

'আমার সঙ্গী আমার পাশেই আছে।' মেয়েটি রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'আমার মন যারে চায় তাকেই তো সঙ্গী করা উচিত, কি বলো? যাদের আমি ঘৃণা করি তাদের সাথে কেমন করে হেসে খেলে বেড়াই।' মেয়েটি উত্তর দিল। 'আমার যাকে ভাল লাগছে, আমি তাকেই পাশে ডেকে নিয়েছি। তুমি তো আমার হাত থেকে পিয়ালা গ্রহণ করলে না?'

'যদি কেউ দেখতে পায়, তবে আমাকে শুলে চড়াবে।' চেঙ্গিস ভয়ার্ত স্বরে বললো।

'কিন্তু যদি তুমি আমার নিবেদন প্রত্যাখ্যান করো, তবে আমিই তোমাকে শুলে চড়াবো।' মেয়েটি হেসে বললো, 'পাগল! তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বলেই না তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো এবং তার কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বললো, 'তুমি আমাকে নিরাশ করো না যুবক।' তখনও তার ঠোঁটের কোণে লেগেছিল ভুবন মোহিনী হাসি।

'কিন্তু আমি তো এখন মদ পান করতে পারবো না। এখন যে আমি ডিউটিতে আছি!' চেঙ্গিস আড়ষ্ট কণ্ঠে বললো।

'আচ্ছা, নাই বা করলে মদ পান।' মেয়েটি তার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'কিন্তু আমি যখন ও যেখানেই ডাকি, সেখানে তোমাকে হাজির হতে হবে।'

রাশেদ চেঙ্গিস এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। সে ধারণা করলো, এই মেয়ে কোন বৃদ্ধ জেনারেলের স্ত্রী হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, তার স্বামী অন্য কোন নারী নিয়ে মেতে

আছে। তারই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এ মেয়ে তাকে বাছাই করেছে।

সে ছিল এক বিচক্ষণ গোয়েন্দা। তাই মেয়েটির আচরণে সে সামান্য বিচলিতও হলো না। এমন সুন্দরী ও অভিজাত যুবতী তার বন্ধুত্বের আকাংখা করেছে, এটা তার কাছে কোন নতুন ঘটনা নয়। চেঙ্গিস এতটাই সুদর্শন ও আর্ষণীয় দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী যে, এর আগেও তাঁকে এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

খৃস্টান সম্রাট ও অফিসারদের মাহফিলগুলো সুন্দরী ও আকর্ষণীয় মেয়েরাই সরগরম করে রাখে। এর আগেও একাধিক মেয়ে চেঙ্গিসের সাথে সম্পর্ক করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু চেঙ্গিস তার কর্তব্যের খাতিরে তাদের এড়িয়ে গেছে। সুলতান আইয়ুবী তাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি ঘটতে পারে এমন কোন কিছুর সাথে সে নিজেকে জড়াতে চায় না।

আলী বিন সুফিয়ান তাকে ট্রেনিং দেয়ার সময় তার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এই চিন্তা, 'নিজের কর্তব্যকেই সব সময় প্রাধান্য দেবে। কখনো এমন কিছুর সাথে নিজেকে জড়াবে না, যাতে দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মেয়ে মানুষের কাছ থেকে সাবধান থাকবে। কখনো আপন বিবি ছাড়া অন্য কারো দিকে নজর দেবে না। মনে রাখবে, দুশমন তোমাদের ঘায়েল করার জন্য যে অস্ত্রটি সবচে বেশী ব্যবহার করবে তার নাম মেয়ে। যারা অন্য নারীর প্রেমে পড়ে যায় বা নেশা ও

বিলাসিতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে; আপন দায়িত্ববোধের কথা তাদের স্মরণ থাকে না। তারা ধীরে ধীরে দায়িত্বহীন হয়ে যায়। তার মন-মগজে মদ ও নারীর মোহ্ এমন বিষের ন্যায় কাজ করে যে, সে ধীরে ধীরে তার ঈমানও হারিয়ে ফেলে। অতএব নেশা ও নারী থেকে সব সময় দূরে থাকবে।'

সম্রাট রিমাণ্ডের রাজপ্রাসাদে এসে সে দেখেছে, রাজার খেয়াল কাকে বলে। এখানে সম্রাট যখন যাকে ইচ্ছা চাকরী প্রদান করে এবং যাকে ইচ্ছা চাকরী থেকে বরখাস্ত করে। রাজার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব যাদুর মত। এখানে এমন কেউ নেই, যে তাকে প্রশ্ন করতে পারে।

এখানে এসে সে আর যে জিনিসটি দেখে অবাক হয়েছে, তাহলো খৃস্টানদের চরিত্র। এদের কাছে চরিত্র বলে কিছু নেই। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনাকে তারা গর্বের বিষয় বলে মনে করে। তাই এখানকার মেয়েরা এমন খোলামেলা প্রেম নিবেদন করলেও সে আর অবাক হয় না।

একজন গোয়েন্দা হিসাবে সে তখন চিন্তা করছিল, মেয়েটির কাছ থেকে তার কিছু পাওয়ার আছে কিনা। সে চিন্তা করে দেখল, এই মেয়েকে ব্যবহার করে সে এমন কিছু তথ্য পেতে পারে, যা অন্যভাবে পাওয়ার উপায় নেই। মেয়েটি যখন তাকে বলছিল, 'আমি যখন ও যেখানেই ডাকি সেখানে তোমাকে হাজির হতে হবে' তার এ বক্তব্যে ধমক বা আদেশের সুর ছিল না বরং ছিল আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের আবেদন। চেঙ্গিস এটা ভাল করে বুঝেছিল বলেই সেও মেয়েটির হাসির উত্তরে

হাসি মুখেই সে প্রস্তাব কবুল করে নিয়েছিল। হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়েই সে তার শিকারকে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করেছিল।

'এখন আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন।' চেঙ্গিস বললো, 'আপনি বরং মেহমানদের কাছে চলে যান।'

'অনুমতি দেবো, তার আগে বলো, তুমি ঠিক ঠিক আসবে তো?'

'আসবো। সময় পেলেই আমি আপনার ডাকে সাড়া দেবো, কথা দিলাম।' চেঙ্গিস বললো, 'কিন্তু আমি তে আপনার ঠিকানা জানি না। আপনি কার স্ত্রী?'

'স্ত্রী নই, আশ্রিতা!' মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক সেনা অফিসারের নাম উল্লেখ করে বললো, 'হতভাগার কাছে অঢেল ধন-সম্পদ আছে। আর এই সম্পদের জোরে সে আমার মত মেয়েদের কিনে নিয়ে তার হেরেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। আমি একা নই, আরো বেশ কিছু মেয়ে আছে তার, যাদের সাথে সে দাসী-বাদীর মত ব্যবহার করে। কিন্তু কে যে তার মনের মানুষ তা আমরা কেউ জানি না।'

'এত লোভ না করে ওখান থেকে চলে এলেই পারেন!'

'না, তা আমরা পারি না। সে আমাকে মুক্তি দিতে নারাজ। বলে, 'তোমার কোন সাধ-আহলাদ আমি অপূর্ণ রাখবো না। তাহলে কেন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?' সেই গর্দভ সম্পদের দম্ভটুকুই চেনে, নারীর মন চেনার সময় কোথায় তার!

যখন বুঝেছি এ লোকের হৃদয়ে দয়া, মায়া, প্রেম বলতে কিছু

নেই তখন থেকেই তাকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছি। সেই ঘৃণা এখন আমার মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে আছে। এই চাপ সহ্য করা আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু যখন তোমাকে দেখলাম, কেন জানি না, তোমাকে আমার ভাল লেগে গেল। বিশ্বাস করো, তুমি আমার কাছে প্রথম পুরুষ, যাকে আমি অন্তর দিয়ে বেছে নিয়েছি।

আমি তোমার কাছ থেকে শারিরীক বা দৈহিক কোন তৃপ্তির পিয়াসী নই। পিপাসা আমার অন্তরের, পিপাসা আমার ভালবাসার। তোমাকে দেখে চোখের পানিতে আমি সে পিপাসা নিবারণ করতে পারবো। দোহাই লাগে, তুমি আমার দৃষ্টির আড়ালে যেও না। আমাকে পাষাণপুরীতে ফেলে রেখে দূরে কোথাও পালিয়ে যেও না। যদি এমন করো তবে আমার ওপর জুলুম করা হবে। আমি সব সইতে পারবো, কিন্তু এ অত্যাচার সইতে পারবো না। এখন যাও, তোমার অনেক সময় আমি নিয়ে ফেলেছি, আর নয়। কাল রাতে আমি নিজেই তোমাকে খুঁজে নেবো, কষ্ট করে তোমাকে আমার কাছে যেতে হবে না।'

০

যে সময় রাশেদ চেঙ্গিস বাগানে মেয়েটির সাথে কথা বলছিল, ভিক্টর তখন মেহমানদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। সে মেহমানদের আপ্যায়ন করছিল ঠিকই কিন্তু তার কান

পড়েছিল ক্রুসেড লিডারদের আলোচনায়। তারা আলোচনা করছিল, কোন দিকে অভিযান চালালে সুবিধা হবে। কোথায় আক্রমণ করলে আইয়ুবী সহজে ধরাশায়ী হবে, এইসব।

এসব আলোচনা থেকে সে তার প্রয়োজনীয় কথা মনে মনে টুকে নিচ্ছিল। কিন্তু তখনও আলোচনা ও পরামর্শ চলছে। সেদিকে কান পেতে দ্রুত হাতে কাজ করছে ভিক্টর।

রাশেদ চেঙ্গিস মেয়েটির কাছ থেকে ছুটি পেয়ে মেহমানদের মধ্যে এসে পড়লো। ঘুরতে ঘুরতে সে সম্রাট রিনাল্টের পাশে চলে এলো। রিনাল্ট তখন তার সাথীদের বলছে, 'তোমরা কোন চিন্তা করো না। এবার আমি এত বেশী সামরিক শক্তি নিয়ে এসেছি, আমার তো মনে হয়, আমি একাই আইয়ুবীকে ধরাশায়ী করে ফেলতে পারবো। ভাবতে পারো, আমার সাথে আছে আড়াইশো নাইট। যাদের প্রত্যেকের আণ্ডারে আছে আলাদা বাহিনী। এক নাইটকে পরাজিত করলে আরেক নাইট এগিয়ে যাবে তার বাহিনী নিয়ে। আইয়ুবী একা কয়টা বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে পারবে?'

এভাবে রিনাল্ট শক্তির বড়াই করছিল আর বড় ধরনের সফলতা ছিনিয়ে এনে দেবে বলে দাবী করছিল সঙ্গীদের কাছে।

রাত কেটে গেল। পরের দিন চেঙ্গিসের কাছে একটি লোক এলো। লোকটি তার দলেরই এক গোয়েন্দা। সে তাকে বলল, 'মধ্য রাতের পর তুমি ইমাম সাহেবের কাছে চলে এসো। সেখানে জরুরী আলোচনা আছে।'

দিন কেটে গেল। রাত হলো। চেঙ্গিস ও ভিক্টর সম্রাট রিমাণ্ডের ভোজ সভায় তাদের ডিউটিতে চলে গেল। অনেক রাতে ডিউটি শেষ হলে ওরা ওখান থেকে ওদের কামরায় ফিরে এলো।

চেঙ্গিস এখনও ভিক্টরকে বলেনি, একটি মেয়ে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চাচ্ছে। ডিউটি থেকে ফিরেই সে ভিক্টরকে বললো, 'পোষাক পাল্টে আমি ইমাম সাহেবের কাছে যাচ্ছি।' ভিক্টর বললো, 'ঠিক আছে যাও।' সে তাকে কিছু তথ্য দিয়ে বললো, 'এগুলো ইমাম সাহেবকে বলো।'

রাশেদ চেঙ্গিস তার পোষাক পরিবর্তন করলো। কৃত্রিম দাড়ি লাগালো মুখে। মাথায় পাগড়ী পরে চেহারা লুকাল। তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

তাদের বাসা থেকে কিছু দূর এগিয়ে গেলেই একটি পার্ক। পার্কের ভেতর দিয়ে মসজিদে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তা আছে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটা ধরল রাশেদ চেঙ্গিস।

বাগানটি হরেক রকম ফুল গাছে ভরা। নিচে সবুজ ঘাসের জাজিম। তার মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথ। ফুল গাছগুলোতে ফুটে আছে হরেক রঙের ফুল। লাল, নীল, হলুদ। গাছে গাছে সবুজ সতেজ পাতা। কিন্তু এখন এসব কিছুই দেখার উপায় নেই। শুধু দেখা যায় ছোট বড় কালো ঝোপগুলো মাথা মুড়ে বসে আছে।

পার্কের আশেপাশে কোন জনবসতি নেই। মানুষের নিত্যদিনের সান্ধ্য কোলাহল থেমে গেছে অনেক আগেই।

এখন সবকিছুই কেমন সুনসান, নিঝুম, নিরব।
বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটছে রাশেদ চেঙ্গিস। এমন সময় এক গাছের আড়াল থেকে একটি ছায়া বের হয়ে তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। চেঙ্গিস লোকটিকে দেখতে পেয়েই তার কৃত্রিম দাড়ি খুলে ফেলল। সে ভাবল, হয়তো কোন পরিচিত পাহারাদার ডিউটিতে আছে, তার গলার স্বর চিনে ফেলতে পারে। এ অবস্থায় দাড়ি দেখলে লোকটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। তার মনে সন্দেহ উঁকি দেবে। তখন সে যদি চ্যালেঞ্জ করে বসে তাহলে বিপদ আছে।
সে তার চলার গতি ধীর করে দিয়ে আস্তে ধীরে পা ফেলে চলতে লাগলো।
ছায়াটি একেবারে তার কাছে এসে বলে উঠলো, 'আমি তোমাকে বলিনি, আমি নিজেই তোমাকে খুঁজে নেবো। কি, ঠিক বলিনি?' কণ্ঠটি একটি নারীর।
কণ্ঠটি চিনে ফেলল রাশেদ চেঙ্গিস। এই তো সে মেয়ে, যে তার সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করেছিল!
'মহলের ব্যস্ততা মাথাটা একেবারে খারাপ করে দিয়েছে।' চেঙ্গিস বললো, 'তাই একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য এদিকে চলে এলাম।'
'আমি তোমার কামরাতেই যাচ্ছিলাম।' মেয়েটি বললো, 'যাক, ভালই হলো। তোমাকে পথেই পেয়ে গেলাম। জায়গাটা মন্দ নয়, কি বলো? ফুলের সৌন্দর্য দেখতে না পারলেও ফুলের সুবাস তো পাবে!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' হাঁটতে হাঁটতেই বললো চেঙ্গিস।
'বসবে, না কি চলতেই থাকবে?' মেয়েটি বলে উঠল, 'আমি কিন্তু সুরাহী ও পিয়ালা সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' হাসি মুখে বলল মেয়েটি।
রাশেদ চেঙ্গিস দাঁড়ালো। একবার ভাবলো, সে কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। বলল, 'তুমি যাঁর আশ্রিতা তিনি তোমাকে খুঁজবেন না?'
'কি যে বলো! আমাকে খোঁজার মত সময় কি তার আছে! নতুন ফুলের মধু ছাড়া তার রাত কাটে না। সে আছে তার মত, আমি আমার মত। ওর কথা মনে করিয়ে দিয়ে তুমি এ মধুর সময়টা মাটি করো নাতো!'
রাশেদ বুঝে নিল, এই মেয়ে এখন আবেগে বিভোর হয়ে আছে। বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সামনে চলছে মেয়েটা, কিন্তু কোন বিপদকেই পরোয়া করার অবস্থা নেই তার। চেষ্টা করলে তার কাছ থেকে হয়তো কিছু গোপান তথ্য আদায় করা যাবে। চেঙ্গিস তাকে বললো, 'আর ভাবছো কেন, শিঘ্রই তো তুমি তোমার প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে!'
'এটা কি করে সম্ভব!' মেয়েটি অবাক হয়ে বলল।
'কেন, তুমিই না বললে সে লোক সেনাবাহিনীর অফিসার! তারা তো অচিরেই যুদ্ধের ময়দানে যাত্রা করবে।'
'হ্যাঁ, সে লোক বিলডন সাহেবের এক জেনারেল।' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'কিন্তু সে আমাকে এবং অন্যান্য মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবে। ফলে তুমি যা ভাবছো তেমনটি আর হচ্ছে

না। তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়।'
'কবে তোমরা যাত্রা করছো, আর কোথায় যাচ্ছো?'
'তা জানি না। তবে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে খুব তাড়াতাড়িই অভিযান শুরু হবে বলে মনে হয়।'
'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এখন কোথায়?' চেঙ্গিস প্রশ্ন করলো।
'সেটা আমি কি করে বলবো?' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'তবে তুমি যদি জানতে চাও, খোঁজ নিয়ে তোমাকে জানাতে পারবো।'
রাশেদ চেঙ্গিস তাকে আরও কিছু প্রশ্ন করলো। যে সব প্রশ্নের উত্তর মেয়েটির জানা ছিল তা সে খুলে বললো। আর যা জানে না সেগুলো জেনে এসে বলবে বলে ওয়াদা করলো। মেয়েটি বললো, 'কে যুদ্ধ করলো, কে মরলো, কে বাঁচলো তা নিয়ে তোমার কি?'
'দেখো, যুদ্ধ যে করে সেই শুধু মরে না, যুদ্ধ সবার জন্যই দুঃখ বয়ে নিয়ে আসে।'
মেয়েটি আবেগের স্বরে বললো, 'আমাকে সে যুদ্ধের ময়দানে যেতে বললেও আমি যাব না। আমি তো তার স্ত্রী নই। আমি আমার মালিকের কেনা দাসীও নই, রক্ষিতা মাত্র। সুলতান আইয়ুবী এখন আর আমার কি ক্ষতি করবে? আমার যারা আপন, যারা আমার ধর্মের ভাই, তারাই আমাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করেছে, যা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, পবিত্র ক্রুশের নাম ভাঙিয়ে যারা আমার ওপর এ নির্যাতন করেছে, তাদেরকে আমি বিষ

দিয়ে হত্যা করি।'

তারা উভয়েই বাগানের এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো। মেয়েটি দু'জনের মাঝখানে পিয়ালা রেখে তাতে মদ ঢেলে একটি পিয়ালা চেঙ্গিসের দিকে এগিয়ে ধরলো। বললো, 'এমন নির্জন নিঝুম রাত আর বাগানের এই পরিবেশ, এ তো যুদ্ধের আলাপের জন্য নয়, ভালবাসার কথা বলার জন্য। নাও, একটু পান করো। ভুলে যাও পৃথিবীর সব দ্বন্দ্ব কোলাহল। এসো হৃদয়ের ভায়োলিনে ভালবাসার গান শুনি।'

চেঙ্গিস মহা বিপদে পড়ে গেলো। সে আজ দেড় বছর যাবত এই মদের কারবারের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। নিজ হাতে কত মেহমানকে মদ পান করিয়েছে, কিন্তু সে নিজে কখনও মদ স্পর্শ করেনি। এমন পাপময় পরিবেশে মাঝে মধ্যে যেখানে বিরাট আকর্ষণীয় দাওয়াত এসে যায়, সেখানেও সে নিজেকে সংযত রেখেছে। ঈমানকে নষ্ট হতে দেয়নি। কিন্তু এখন এমন এক নারীর পাল্লায় পড়ে গেল, যার মাধ্যমে সে তার দায়িত্ব পালনকে আরও সহজ করতে চায়। কিন্তু মুশকিল হলো, এই নারী তাকে মদ পান করতে বলছে। ভয় হচ্ছে, যদি এই আবেগময়ী নারীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে তবে সে হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে।

একদিকে ঈমানের দাবী, অন্যদিকে দায়িত্ব পালনের হাতিয়ার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়, কোনটা রাখবে সে? ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেল চেঙ্গিস। কর্তব্যের খাতিরে দু'এক ঢোক পান করবে, নাকি এমন দামী হাতিয়ার

মেয়েটাকে হারানোর ঝুঁকি নেবে, বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল, 'কিন্তু আমি তো পান করা পছন্দ করি না।'

'খোদা তোমাকে পুরুষের সকল সৌন্দর্য, বীরত্ব ও আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন।' মেয়েটি বললো, 'কিন্তু মদকে অস্বীকার করে তুমি প্রমাণ করলে, তুমি এক সুন্দর প্রাণহীন পাথর।'

কিছুক্ষণ দু'জনের মধ্যে এই নিয়ে বাদানুবাদ চললো। শেষে চেঙ্গিস মেয়েটার মন রক্ষার জন্য তার হাত থেকে পিয়ালা নিয়ে নিল।

চেঙ্গিস কম্পিত হাতে পিয়ালা মুখে লাগালো এবং ধীরে ধীরে পিয়ালা খালি করে দিল। জীবনে এই প্রথম সে মদ পান করলো। কিছুক্ষণ পরই সে অনুভব করলো, তার চোখের সামনে সবকিছু কেমন উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তার চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আশপাশের ঝোপগুলো মনে হচ্ছে উড়ছে। আর তখনি তার মনে হলো, সে নিজেও উড়ছে! সে খুব উৎফুল্ল বোধ করলো। তার মনে হতে লাগল, সে এক আনন্দ নগরে প্রবেশ করেছে।

রাশেদ চেঙ্গিস ছিল অবিবাহিত যুবক। নারী দেহ স্পর্শের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। যৌবনে পা দিয়েই সে গোয়েন্দাগিরীতে ঢুকে পড়েছিল। গোয়েন্দা অভিযানের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাই ছিল তার একমাত্র আনন্দের বিষয়।

অবিবাহিত থাকায় তার কোন পিছু টান ছিল না। ফলে সে

ছিল বেপরোয়া ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। কিন্তু এখন এই গভীর রাতে বাগানের পুষ্পিত ঘ্রাণের ভেতর এক সুন্দরী নারী তাকে মদ পান করিয়ে দেহের সাথে দেহ লাগিয়ে বসে আছে। সে তাকে নানা আভাসে ও ইঙ্গিতে প্রলুব্ধ করতে চাচ্ছে। কিন্তু সেই ইঙ্গিত বুঝার মত মনমানসিকতা তার ছিল না। অবিবাহিত হওয়াই তাকে যেন বাঁচিয়ে দিল। অজ্ঞতা ও আনাড়িপনাই সম্বল হয়ে দাঁড়াল তার।

সেই নারী তাকে পাপের দিকে ডাকছিল। তার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা চাচ্ছিল। কিন্তু নেশাগ্রস্ত রাশেদ চেঙ্গিসের স্বভাবে কোন পাপ ছিল না। তাই সে এই খৃস্টান মেয়ের কোন আহবানই বুঝতে পারছিল না।

মেয়েটি এবার আরো সক্রিয় হলো। আগের রাশেদ চেঙ্গিশ আর থাকতে দিল না তাকে। প্রেমিক এক রাশেদ চেঙ্গিস তৈরীতে মনযোগী হল সে। রাত ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেতে লাগলো।

সে যখন মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো, মেয়েটি বললো, 'তুমি আমাকে যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু কথা জিজ্ঞেস করেছিলে। আমার তো সবটা জানা নেই। যদি তুমি চাও তবে আমি আগামী কাল রাতে সে উত্তর সংগ্রহ করে আনবো।'

সহসা চেঙ্গিসের মধ্যে সেই আগের চেঙ্গিস জেগে উঠলো, যে চেঙ্গিস সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা। সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ হলো। সেই সাথে তার মনে পড়লো, সে

এক সুন্দরী নারী ও মদের নেশায় মত্ত আছে, যার থেকে
তাকে সাবধান হতে হবে।

সে মেয়েটিকে বললো, 'তোমার মত আমারও যুদ্ধ বিগ্রহের
সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আমি আরাম ও শান্তিতে জীব
কাটাতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আমার মনীব যুদ্ধে যা
তবে আমাকেও তার সঙ্গে যেতে হতে পারে। যদি আগে
জানতে পারি, আমাদের সেনাবাহিনী কোন দিকে ও কত দূ
আক্রমণ করতে যাচ্ছে, তবে সেই ভাবে আমি প্রস্তুত হ
যেতে পারবো। কতটুকু মদ সঙ্গে নিতে হবে, চাকর-বাক
কেমন নিতে হবে, এইসব ঠিক করতে পারবো।'

'ঠিক আছে, কাল রাতে তোমাকে সব আমি জানিয়ে দেবো
বলল মেয়েটি।

০

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। চেঙ্গিস ফিরে এসে ভাব
এত রাতে ভিক্টরকে জাগানো উচিত হবে না। তার দু
হচ্ছিল এই ভেবে, আমি তো ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষ
করতে যাচ্ছিলাম। মাঝ পথে মেয়েটি আমাকে আটকে দি
হায়, হায়, মেয়েটি আমাকে কোত্থেকে কোথায় নামিয়ে নি
রাতের তখন শেষ প্রহর। খৃস্টানদের বিলাস জীবনে খুব ভো
ঘুম থেকে উঠার কোন অভ্যাস ছিল না। চেঙ্গিস ইচ্ছা কর
তখনো ইমাম সহেবের কাছে যেতে পারতো। কিন্তু মু
মদের গন্ধ নিয়ে মসজিদে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। প

ইমাম সাহেব আবার কি ভেবে বসেন!
তাছাড়া তার নিজের মনেও চেপে ছিল এক পাপের বোঝা। যে মদ হারাম, যা পান করা পাপের কাজ, সেই মদ আমি পান করেছি!
মেয়েটির কথাও স্মরণ হলো তার। মেয়েটির ভালবাসার আকুতি ও উন্মাদনা নেশার মত তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যদিও মেয়েটি তাকে পাপের সাগরে ডুবাতে পারেনি, কিন্তু তার দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, এ জন্য তার আফসোস হচ্ছিল।
সে শুয়ে পড়ল, কিন্তু চোখে তার ঘুম এলো না। একবার মেয়েটির হাসিমাখা মুখ ভেসে উঠছিল তার হৃদয়পটে, আবার মেয়েটির প্রতি সৃষ্টি হচ্ছিল রাগ ও ক্ষোভ। কারণ এ মেয়ে তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি।
এভাবে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো মেয়েটি। যতই ভাবছিল ততই মেয়েটি তার হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছিল। মেয়েটির কথা তার যতবার মনে পড়ছিল, ততই তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছিল তার।
আবার ইমাম সাহেবের কথা মনে হলেই অনুশোচনা হচ্ছিল। তিনি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করেছেন। হয়তো দুশ্চিন্তা করছেন আমার কথা ভেবে। নিশ্চয়ই কোন জরুরী বিষয় ছিল, যে জন্য তিনি আমাকে খবর দেয়ার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এইসব অনুশোচনা করতে করতেই এক সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল রাশেদ চেঙ্গিস।

সূর্য অনেক উপরে উঠে গেছে। তখনো তার ঘুম ভাঙেনি দেখে ভিক্টর তাকে জাগিয়ে দিল। বলল, 'কাল কখন ফিরেছো? আমি তো কিছুই টের পাইনি! ইমাম সাহেবের সাথে এত দীর্ঘক্ষণ কি আলোচনা করলে? কেন ডেকেছিলেন তিনি?'

রাশেদ চেঙ্গিস ধড়ফড় করে উঠে বসল। মনে পড়ে গেল তার কাল রাতের কথা। সে মাথা নিচু করে বসে রইল, ভিক্টরের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

ভিক্টরই আবার মুখ খুলল। বলল, 'কই, কথা বলছো না কেন? কোন সমস্যা?' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'না! তেমন কিছুই হয়নি।' ভিক্টরকে হতভম্ব করে দিয়ে চেঙ্গিস বলল, 'কাল আমি মসজিদ পর্যন্ত যেতেই পারিনি।'

'কি বলছো তুমি! কি হয়েছিল? কেউ অনুসরণ করেছিল?' বিস্ময় ও উদ্বেগ ভিক্টরের কণ্ঠে, 'রাশেদ, কাল রাতে কি ঘটেছিল সব আমাকে খুলে বলো তো!'

সে ভিক্টরকে সমস্ত ঘটনাই খুলে বলল। মেয়েটির সাথে পরিচয় থেকে শুরু করে গত রাতের মদ পানের কাহিনী পর্যন্ত। শেষে বললো, 'যদি আমি মদ পান না করতাম তবে মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পরেও আমি ওখানে যেতে পারতাম। কিন্তু মুখে মদের গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়ার সাহস আমার হলো না।'

দায়িত্বে গাফলতির জন্য মরমে মরে যাচ্ছিল রাশেদ চেঙ্গিস। তার চেহারা হয়ে উঠেছিল বর্ষা রাতের থমথমে আকাশের মত। সেখানে বাসা বেঁধেছিল রাজ্যের মালিন্য ও বিষণ্নতা।

এ রকম দায়িত্বহীনতার পরও ভিক্টর তাকে গালাগালি করল না। বরং তাকে শান্তনা দিয়ে বলল, 'যদি দায়িত্ব পালনের স্বার্থে মেয়েটার হাত থেকে দুই ঢোক মদ গিলেই থাকো, আল্লাহর কাছে মাফ চাও, তিনি তোমাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তবে তওবা করো, ভবিষ্যতে আর কোনদিন মদ পান করবে না।'

ভিক্টর তাকে সাবধান করে আরো বললো, 'কিন্তু ইমাম সাহেবের কাছে না যাওয়াটা তোমার মস্ত বড় অপরাধ হয়েছে। এটা তোমার মোটেই উচিত হয়নি। ইমাম সাহেব নিশ্চয় সারা রাত অধীর হয়ে তোমার অপেক্ষায় জেগেছিলেন! যাক, দিনে যাওয়া তো সম্ভব নয়, আজ রাতে অবশ্যই যাবে। গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। তবে সব কথা তাকে বলার দরকার নেই। শুধু বলো, বিশেষ অসুবিধার কারণে কাল যেতে পারোনি।'

'কিন্তু মেয়েটা তো কাল খবর নিয়ে আসবে বলেছে।' বলল রাশেদ চেঙ্গিস।

ভিক্টর তাকে বললো, 'দেখো চেঙ্গিস! তুমি আনাড়ী বা অবুঝ নও! নিজে ভাল মত বুঝতে চেষ্টা করো, মেয়েটির আসল উদ্দেশ্যটা কি? সে কি তোমাকে আসলেই মনেপ্রাণে ভালবাসে, নাকি ছলনা করছে? সে কি তোমাকে তার দেহের ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম বানাতে চায়, নাকি তুমি গোয়েন্দা কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। তোমাদের মধ্যে যে কথা হয়েছে তাতে তোমাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ

আছে। তুমি যেভাবেই বলো না কেন, যুদ্ধের ব্যাপারে তুমি উৎসাহ বা আগ্রহ দেখিয়েছো, এটা বুঝতে কোন আনাড়ি গোয়েন্দারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। মেয়েটি যে ক্রুসেডদের গোয়েন্দা নয়, তাই বা তোমাকে কে বলল? তাই এ ব্যাপারে তোমাকে খুবই হুশিয়ারীর সাথে অগ্রসর হতে হবে।'

'আমি যে গোয়েন্দা তা তো এখানকার কাকপক্ষীও জানে না। এমনকি শয়তানেরও এটা জানার কথা নয়।' বলল রাশেদ চেঙ্গিস।

'কিন্তু আমি তোমাকে এ কথা বলা জরুরী মনে করছি, মেয়েদের ছলনার যাদুতে ফেরাউনের মত সম্রাটের সিংহাসনও মাটিতে মিশে গেছে। শুধু তাই নয়, আপন জাতির দিকেই একবার তাকিয়ে দেখো না। খৃস্টানদের পাঠানো সুন্দরী মেয়েদের ছলনার যাদুতে মিশরে বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটেছে। সুলতান আইয়ুবীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত আছে বলেই তিনি বেঁচে গেছেন। নইলে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতক হওয়ার পর তাঁর বাঁচার কোন কথা ছিল না।'

'আমি কোন আনাড়ী গোয়েন্দা নই ব্রাদার ভিক্টর।' রাশেদ চেঙ্গিস বললো, 'এই মেয়েটিকে নির্যাতীত বলেই মনে হয়। সে কোন পতিতা নয়। সে কোন রাজকন্যা না হলেও নিশ্চয়ই কোন অভিজাত ঘরের সন্তান। আমার মনে হয়, সে পবিত্র ভালবাসাই পাওয়ার পিয়াসী। সে আমার কাছে দৈহিক ভালবাসা দাবী করেনি, আর করবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু

তার পবিত্র ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে তাকে আরও মজলুম বানাতে চাই না। তাই বলে তুমি ভেবো না, আমি তার গোলাম হয়ে যাবো। প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য তার যতটুকু সান্নিধ্যে যাওয়া দরকার, তার সাথে আমি শুধু ততটুকুই ঘনিষ্ঠ হবো।'

'কিন্তু এ বড় কঠিন রোগ ভায়া, তুমি নিজেও টের পাবে না কখন থেকে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শুরু করেছ।'

'হ্যাঁ ভিক্টর!' চেঙ্গিস উত্তর দিল, 'তুমি ঠিকই বলেছো। শুরুতে আমি এটাকে একটা খেলাই মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম, খেলতে খেলতে যদি কিছু তথ্য পেয়ে যাই মন্দ কি! কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মেয়েটি সত্যি আমার অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেছে।'

'যে অন্তরে গেঁথে যেতে পারে সে কিন্তু পায়ের শিকলও হয়ে যেতে পারে চেঙ্গিস!' ভিক্টর বললো, 'আমি তোমাকে এর চেয়ে বেশী আর কি বলতে পারি। তুমি যে পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছো, তোমার সবটুকু ভালবাসা তাতেই উজাড় করে দেয়া উচিত। দায়িত্বের চেয়ে অন্য কিছুকে অধিক ভালবাসলে তার পরিণাম ফল ভয়াবহ হতে পারে।'

'আরে, আমি তো তোমাকে বললামই, দায়িত্ব পালনের জন্যই আমি তার সাথে সম্পর্ক গড়তে চাচ্ছি, দায়িত্বকে আমি অবহেলা করলাম কই?'

'শোন, কল্পনা ও বাস্তবতা এক জিনিস নয়। আলো ও কালোর মধ্যে প্রভেদ অনেক, কিন্তু তাদের দূরত্ব এক চুলের অধিক

নয়। বিবেক ও আবেগের মাঝখানে বা ঈমান ও নির্বুদ্ধিতার মাঝখানে যে প্রাচীর আছে তুমি যদি সেই প্রাচীরের ওপর দিয়েই হাঁটতে শুরু করো, তবে যে কোন সময় তুমি একদিকে কাত হয়ে পড়ে যেতে পারো। এ এমনই এক সুক্ষ্ম রেখা যার ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না। শেষে এমন না হয়ে যায়, তার কাছ থেকে গোপন তথ্য নিতে গিয়ে তুমি নিজেই গোপন হয়ে যাও।'

রাশেদ চেঙ্গিস হো হো করে হেসে উঠে ভিক্টরের উরুতে থাবা মেরে বললো, 'এমন হবে না বন্ধু! তুমি দেখে নিও, এমনটি কখনো হবে না!'

'আর একটি কথা।' ভিক্টর বললো, 'মদের সম্পর্ক থাকে শয়তানের সাথে। যেসব গুণ শয়তানের মধ্যে থাকে সে সব গুণ মদের মধ্যেও থাকে। মেয়েটিকে খুশী করতে গিয়ে সেই পরিমাণ পান করো না, যে পরিমাণ পান করলে তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পায়।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার এ উপদেশের কথা আমি স্মরণ রাখবো। আজ রাতেই ইমাম সাহেবের সাথে আমি দেখা করবো এবং তাকে জানাবো, গতকাল বিশেষ কারণে আমি তার সাথে দেখা করতে পারিনি।' চেঙ্গিস বললো।

'আর এখনি বাজারে যাও। যাতে ইমাম সাহেব জানতে পারেন, তুমি সহিসালামতে আছো।' ভিক্টর বললো।

তাদের দু'চার জন সঙ্গীর বাজারে দোকান ছিল। ছোটখাট সংবাদ তাদের দ্বারাই পৌছানো যেতো। অবশ্য অতি দরকারী

ও গোপনীয় সংবাদ তাদের দিয়ে পৌঁছানো হতো না।

'তুমি এখন কি করবে? চলো দু'জনেই ঘুরে আসি।' বলল চেঙ্গিস।

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টর দু'জনেই বাজারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

০

পরের রাতে চেঙ্গিস তার ডিউটি থেকে একটু আগেই বিদায় নিল। সে তার কামরায় গিয়ে ডিউটির পোষাক পরিবর্তন করলো। মুখে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। সে ভয় পাচ্ছিল, যদি মেয়েটি হঠাৎ তাকে দেখে ফেলে! সে ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে ফেরার পথে মেয়েটির সাথে দেখা করবে বলে ঠিক করল।

আজো সে বাগানের সেই সংক্ষিপ্ত পথেই মসজিদের দিকে রওনা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সবুজ ঘাস ও বৃক্ষ শোভিত বাগানে গিয়ে প্রবেশ করল। সে দ্রুত হাঁটছিল, কিন্তু আজও সামনে থেকে কাউকে আসতে দেখলো। চেঙ্গিসের পালাবার কোন পথ ছিল না। কি মনে করে সে সাবধানে দাড়ি খুলে ফেললো। শীঘ্রই সামনের লোকটি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আজ যে খুব তাড়াতাড়ি চলে এলে! আমার ভালবাসার টানে বুঝি?'

'তুমিই বা এত জলদি কি মনে করে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করলো, 'এখনও তো রাত বারোটার ঘন্টা পড়েনি!'

'আমার মন বলছিল, তুমি মধ্য রাতের ঘন্টা বাজার আগেই চলে আসবে।' মেয়েটি বললো।

'কিন্তু আমি আশা করিনি, তুমি এত তাড়াতাড়ি আসবে।' চেঙ্গিস বললো, 'আমি একটা কাজে যাচ্ছিলাম, ফেরার পথে তোমার সাথে দেখা করতাম।'

'যদি তোমার কাজ খুব জরুরী হয়, তবে যাও।' মেয়েটি বললো, 'আমি সারারাত তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো।'

'এখন তো আমি এখান থেকে নড়তেও পারবো না।' চেঙ্গিস বললো, 'তোমার চুলের ঘ্রাণ আমাকে পাগল করে দিয়েছে।'

কথাটা সে মুখে বলল ঠিকই, কিন্তু নিজেকে সে স্বাভাবিক ও সচেতন রাখলো।

একবার ভাবল, ইমাম সাহেবের কাছ থেকে ঘুরে আসি। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা বাতিল করে দিল। সে সন্দেহ করলো, ইমামের কাছে রওনা দিলে যদি মেয়েটা পিছু নেয়! সুতরাং ভালবাসার দাবীকে প্রাধান্য দিয়ে সে সেখানে বসে পড়ল।

মেয়েটা সুরাহী থেকে মদ ঢেলে একটি পিয়ালা চেঙ্গিসের দিকে বাড়িয়ে ধরল। চেঙ্গিস মদ পান করতে চাইল না। বলল, 'না না, আমার এখন পান করার ইচ্ছে নেই।'

মেয়েটি বলল, 'তুমি যদি আমাকে বিষের পিয়ালা দাও তবুও তা পান করতে আমি প্রস্তুত। আর তুমি আমার কাছ থেকে মদ নেবে না?'

চেঙ্গিস কণ্ঠে আবেগ এনে বললো, 'মদ দিয়ে কি করবো সুন্দরী। তোমার রূপের নেশার কাছে সব নেশাই যে ম্লান হয়ে যায়!'

'তুমি দেখছি মুসলমানদের মত কথা বলছো! ওদের ধর্ম তো মদকে হারামই করে দিয়েছে। কিন্তু একজন খৃষ্টান হয়ে তুমি কেন মদকে ঘৃণা করো?'

'মদের নেশা তোমার ভালবাসা ও সৌন্দর্যের কাছে হার মেনে যায়, তাই।' চেঙ্গিস বললো, 'তুমি যেমন অঢেল ধনরত্ন ও বিলাসিতার গায়ে লাথি মেরে আমার মত এক নগন্য কর্মচারীর কাছে ছুটে এসেছো, আমার মনও তেমনি কোন কৃত্রিম জিনিস গ্রহণ করতে চায় না। মদের নেশার চেয়ে এই প্রেমের নেশা অনেক বেশী খাঁটি এবং দীর্ঘস্থায়ী।'

তার এ কথায় হয়তো মিথ্যের কিছু মিশেল ছিল কিন্তু যতই সময় যেতে লাগলো তার বুদ্ধি-বিবেকের ওপর মেয়েটি ততই প্রাধান্য বিস্তার করতে লাগলো। তারপর এমন মুহূর্ত এসে গেল যে, সে নিজেই পিয়ালা উঠিয়ে বলল, 'দাও, আরও দাও।'

মেয়েটি তার পিয়ালা পূর্ণ করে দিল। সে ধীরে ধীরে পান করতে লাগলো আর ক্রমেই মেয়েটির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে লাগল।

'আমরা আর কতদিন এমন গোপনে চোরের মত মেলামেশা করতে থাকবো?' মেয়েটি বললো, 'আমার কথা একটু চিন্তা করো, ভেবে দেখো আমি কেমন কষ্টের মধ্যে আছি। আমার

দেহের মালিক অন্য কেউ আর মনের মালিক তুমি। তোমার ভালবাসা তার প্রতি আমার ঘৃণা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমি তাকে আর সহ্যই করতে পারছি না। এসো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'কোথায় যাবো?' চেঙ্গিস প্রশ্ন করলো।

'এই পৃথিবীটা বিশাল ও অনেক প্রশস্ত!' মেয়েটি বললো, 'আমাকে এখান থেকে বের করো, তারপর তোমার হাত ধরে আমি পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত।'

'আচ্ছা যাবো।' চেঙ্গিস বললো, 'কটা দিন সবুর করো, আমি একটু গুছিয়ে নিই। ভাল কথা, আমার প্রশ্নের উত্তর এনেছো?'

'হ্যাঁ, এনেছি।' মেয়েটি বললো, 'আমাদের সৈন্য জড়ো হচ্ছে।' সে কার সৈন্যবাহিনী কোথায় জড়ো হবে, তারা কি করতে চায় সব খবরই তাকে খুলে বলল। কিন্তু কবে তারা রওনা দেবে এই খবরটাই সে তাকে দিতে পারল না। কারণ কবে তারা রওনা দেবে সে সংবাদ এখনও জানতে পারেনি মেয়েটি। চেঙ্গিস তার কাছ থেকে খুঁটে খুঁটে সব জেনে নিল।

সে যখন সেখান থেকে উঠলো, তখন রাত প্রবেশ করছিল দিনের ভেতর, আর মেয়েটি প্রবেশ করছিল চেঙ্গিসের অন্তরে।

o

'আমি ইমাম সাহেবের কাছে যদিও পৌঁছতে পারিনি কিন্তু আমি মেয়েটির কাছ থেকে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি।' চেঙ্গিস ভিক্টরকে বললো, 'সে আমার ফাঁদে পড়ে

গেছে, এখন সে আমার হাতের খেলনা।'

'আমার তো ধারণা হচ্ছে, তুমিই তার ফাঁদে আটকে গেছো।' ভিক্টর তাকে বললো, 'তোমার কথাই প্রমাণ করছে, তার তীর তোমার হৃদয়ে বিঁধে গেছে।'

'আমি তো তোমার কাছে স্বীকারই করেছি, সে আমার মনের গভীরে আসন গেড়ে বসেছে।' চেঙ্গিস বললো, 'সে এ কথাও বলে দিয়েছে, সে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু আমিই তাকে বলেছি, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো। আমি তাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো। আমি আশা করছি, ক্রুসেড বাহিনীর পরিকল্পনা জেনে সে তথ্য আমি নিজেই কায়রো নিয়ে যাবো আর ওই মেয়েটিও থাকবে আমার সঙ্গে।'

'তাকে কখন বলবে যে তুমি মুসলমান আর তুমি এখানে গোয়েন্দাগিরী করতে এসেছ?'

'মিশরের মাটিতে প্রবেশ করে!' চেঙ্গিস উত্তর দিল, 'এখানে তাকে সামান্যই বলবো!'

চেঙ্গিস ভালবাসার নেশায় উন্মত্ত হয়ে গেল। সে খৃষ্টানদের পরিকল্পনা জানার জন্য যে পরিমাণ অধীর ছিল তার চেয়েও বেশী অশান্ত ছিল মেয়েটার সাথে দেখা করার জন্য। সে নিজেই অনুভব করছিল, তার চিন্তা রাজ্যে এবং দৈনন্দিন জীবনের গতি ধারায় ভীষণ পরিবর্তন এসে গেছে। প্রথম যখন সে মদ পান করেছিল, তখন সে খুব অনুতপ্ত ছিল। কিন্তু গত রাতে সে নিজের মর্জিতেই মদের পিয়ালা হাতে তুলে

নিয়েছিল। এখন আর তার কোন অনুশোচনা নেই। এক মুমীনের জন্য এটা এক বিরাট পরিবর্তন।

সে দিন সন্ধ্যায় তাকে বলা হলো, 'কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট ও তাদের সেনাবাহিনীর হাইকমাণ্ড এখানে আসছেন। সম্রাট রিমাণ্ড তাদের নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

রাতে মেহমানরা আসতে লাগলো। ভিক্টররা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের সেবায়। কিন্তু এ দিন আগের মত তেমন ভীড় ছিল না। মাত্র সামান্য কয়েকজন বিশিষ্ট মেহমান। চূড়ান্ত পরিকল্পনার জন্য তারা এক গোপন বৈঠকে বসেছিল।

ভিক্টর ও চেঙ্গিস মহা ব্যস্ত। এই বৈঠকে উপস্থিত বিশিষ্ট মেহমানদের আহারাদির জন্য স্পেশাল বাবুর্চি ডাকা হলো। আয়োজন করা হলো রাজকীয় বিশেষ ডিনার।

এ মিটিংয়ে ক্রুসেড ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান হরমন উপস্থিত আছেন। শুরুতেই মেহমানদেরকে স্পেশাল মদ দিয়ে আপ্যায়িত করা হলো। মেহমানরা যুদ্ধের খুঁটিনাটি পরিকল্পনা ও অভিযানের কথা আলাপ করতে লাগলো। এ আলোচনা কোন বাদানুবাদের আলোচনা ছিল না, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনা ছিল। এতে প্ল্যানের একটা নকশা ও আক্রমণের খসড়া পরিকল্পনা হাজির করা হলো। তাদের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল, খুব শীঘ্রই তারা অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে।

হরমনকে তার গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'যে সব জায়গায় ক্রুসেড বাহিনী

আছে, সেখানে গোয়েন্দা তৎপরতাও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ক্রুসেড বাহিনীর অগ্রাভিযানের প্রতিটি পথে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে গোয়েন্দা কর্মীদের। তারা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দাদেরকে চিরুনী অভিযান চালিয়ে তালাশ করছে। অনুসন্ধান করে যাদের পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।'

'ত্রিপলীর কি অবস্থা?' জানতে চাইলেন এক সম্রাট।

'ত্রিপলীতে যেহেতু ক্রুসেড বাহিনী সবচেয়ে বিশাল সমাবেশ করছে, সে জন্য এখানেও গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এখানে শত্রুর গোয়েন্দা ধরার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। আমি এখানেও শত্রুর গোয়েন্দা বাহিনীর গন্ধ পেয়েছি। এই গন্ধ শুঁকে শুঁকে অগ্রসর হচ্ছে আমাদের বাহিনী। সন্দেহভাজনদের তৎপরতার ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। যদি এখানে একটি গোয়েন্দাও পাওয়া যায়, তবে তার সূত্র ধরেই আমরা পুরো দলটিকে গ্রেফতার করতে পারবো।'

'আর কায়রোর অবস্থা?' জানতে চাইলেন আরেক সম্রাট।

'কায়রোতেও আমাদের গোয়েন্দারা পরিপূর্ণ সক্রিয় রয়েছে। তাদেরকে আরো সতর্ক ও সজাগ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে গতকাল আমাদের এক বাহক এসেছে। সে বলেছে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সেখানে নতুন সৈন্য ভর্তি ও তাদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ জোরেশোরে শুরু করেছে। জেরুজালেম আক্রমণের চিন্তা সে এখনো মাথা থেকে বাদ দেয়নি। এই কথা সে ওখানে জোরেশোরেই প্রচার

করছে।'

খৃস্টানদের এই বৈঠক থেকে চেঙ্গিস ও ভিক্টর যেটুকু জানতে পেরেছিল, যদি সেইটুকুই কায়রো পৌছে দেয়া যেত, তবে সুলতান আইয়ুবীর জন্য যথেষ্ট উপকার হতো। তার কাছে এ সংবাদ আরও আগেই পৌছানো উচিত ছিল যে, ক্রুসেড বাহিনী শীঘ্রই অভিযান চালাচ্ছে আর তাদের অভিযান হবে হারান ও হলব অভিমুখে।

বৈঠক শেষ হলো মাঝ রাতেরও পর। মেহমানদের বিদায় দিয়ে অনেক রাত্রে চেঙ্গিস ও ভিক্টর সেখান থেকে বিদায় পেলো। কামরায় আসার পথেই ভিক্টর চেঙ্গিসকে বললো, 'তাড়াতাড়ি ইমাম সাহেবের কাছ যাও।'

রাশেদ চেঙ্গিস প্রতিদিনের মত পোষাক পাল্টে কৃত্রিম দাড়ি পরে দেরী না করেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। যেহেতু আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, সে জন্য মেয়েটা তাকে রাস্তায় আটকাবে এমন কোন ভয় ছিল না তার। সে প্রশান্ত মনেই কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

o

তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। সে যখন সেই সবুজ শ্যামল বাগানে গিয়ে পৌঁছল, মেয়েটি তাকে থামিয়ে দিল। চেঙ্গিস তখনও এ কথা জিজ্ঞেস করলো না বা চিন্তাও করলো না যে, মেয়েটা থাকে কোথায় এবং সে তাকে এই

অন্ধকারেও কেমন করে দেখতে পায়।
মেয়েটির হাবভাবে মনে হয়, সে সব সময় এমনকি চব্বিশটা ঘন্টাই তার পাশেপাশে থাকে। সে চেঙ্গিসের প্রতিটি পদক্ষেপ ও পদধ্বনি শুনতে পায়। দিনের বেলা তো বটেই, এমনকি অন্ধকার রাতেও।
চেঙ্গিস মেয়েটিকে দেখতে পেয়েই তার দায়িত্বের কথা ভুলে গেল। প্রতিদিনের মতই তারা বাগানের ভেতর অভিসারে মেতে উঠল। এদিকে কেমন করে সময় গড়িয়ে গিয়ে সকাল হলো সেদিকে কোন খেয়ালই করলো না।
এসব দিকে লক্ষ্য করার তার সময় কোথায়? সে তো এক মেয়ের প্রেমে মজে আছে। তার মন-মগজ আচ্ছন্ন করে বসে আছে এই মেয়ে। সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে রইল, আজ রাতেও ইমাম সাহেবের কাছে যেতে পারলো না।
এ জন্য তার মনে যে খুব দু:খ বা আফসোস হলো, তাও না। কারণ মেয়েটা তার দুঃখের কাহিনী এমন ভাবে প্রকাশ করতে শুরু করলো যে, সে কথা শুনতে শুনতেই চেঙ্গিসের রাত কাবার হয়ে গেল।
'আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও।' মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'দেখে তো আমাকে সবাই রাজকন্যা বলে, রাণী মনে করে। কিন্তু আমার জীবনটা এমন নরকময়! তুমি যদি আমাকে কাছ থেকে দেখতে তবে তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠতো। তোমার কাছে সত্য প্রকাশ করতে আজ আর আমার কোন দ্বিধা নেই। কারণ আমি চাই না

আমার পরিচয় গোপন করে তোমাকে প্রতারিত করি। তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ঘৃণা করতে পারো, কারণ আমি তোমার ধর্মের লোক নই।

আমি এক মুসলমান মা-বাবার আদরের কন্যা। হরিণের সুস্বাদু গোশতই তার দুশমন। কারণ, হরিণের গোশত সুস্বাদু না হলে কেউ তাকে শিকার করতো না। তেমনি আমার সৌন্দর্যই আমার কষ্টের কারণ। আর এ যাতনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। পনেরো বছর বয়সে আমার বাবা আমাকে এক আরব বণিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমার বাবা গরীব লোক ছিল না, কিন্তু লোভী ছিল। আমরা ছিলাম ছয় বোন। সে মেয়েদের প্রতি মোটেই দরদী ছিল না। আমার বড় দুই বোন পিতার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাদের প্রেমিকের সাথে পালিয়ে যায়। এই দুঃখে বাবা আমাকে বিক্রি করে দেয়।

এক বছর পর বণিক এক খৃস্টান সামরিক অফিসারের কাছে আমাকে উপহার স্বরূপ পাঠায়। কিছুদিন পর সে অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। তখন আমি সেই অফিসারের বাসা থেকে পালিয়ে আসি। কিন্তু পালিয়ে আমি যাবো কোথায়?

এক খৃস্টান আমাকে আশ্রয় দিল কিন্তু আমার দেহটাকে তার রুজি ও উপার্জনের উৎস বানিয়ে নিল। আমি কোন নিচু দরের নিশিকন্যা ছিলাম না। সে আমাকে ক্রুসেড বাহিনীর উঁচু দরের অফিসার ও কমাণ্ডারদের কাছে কিছু দিনের জন্য পাঠিয়ে দিত। আমি সেই অফিসার বা কমাণ্ডারের কাছে রাণীর মত

থাকতাম। তারা আমাকে খুশী করার জন্য অলংকার বানিয়ে দিত, মাঝে মধ্যে নগদ অর্থও দিত। আমার সর্বপ্রকার আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতো। মোট কথা, সেখানে আমি রাণীর হালেই থাকতাম।

কিন্তু তবু আমার মনে কোন শান্তি ছিল না। এই পেশাতে বড় বড় সামরিক অফিসারের সাথে আমার মেলামেশার সুযোগ হলো। আমি জন্ম থেকেই বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মেয়ে হিসাবে সবার প্রিয় ছিলাম। শীঘ্রই আমি শাসকশ্রেণী, এমনকি রাজা-বাদশাহর সাথেও পরিচিত হয়ে উঠলাম। তারা আমাকে গোয়েন্দাগিরীর প্রশিক্ষণ দিয়ে গোয়েন্দা কাজে ব্যবহার করতে লাগলো।

একবার আমাকে বাগদাদে পাঠানো হলো। সেখানে নূরুদ্দিন জঙ্গীর এক সেনাপতিকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়াতে গিয়েছিলাম। আমি সেখানে খুবই সাফল্য লাভ করি এবং অত্যন্ত নিপূণভাবে আমার দায়িত্ব সমাধা করি। এতে গোয়েন্দা মহলে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ গোয়েন্দাদের চোখে আমি শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠি। এরপর আমার ওপর আরো বড় বড় দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং আমি কুশলী হাতেই সে সব দায়িত্ব পালন করি।

আমি যদি এখন তোমাকে আমার গোয়েন্দা কর্মের ফিরিস্তি শোনাতে শুরু করি, তবে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। হয়তো সব কথা বিশ্বাসও করবে না। সেই লম্বা কাহিনী রেখে এবার আসল কথায় আসি।

এক সময় আমার দায়িত্ব এই জেনারেলের হাতে পড়ে। তিনি আমাকে তার আশ্রিতা হিসেবে রেখে দেন। এই জেনারেল একজন প্রবীণ ও বৃদ্ধ মানুষ। তিনি আমাকে সুখে শান্তিতে রাখতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করছেন না। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে খুব গর্বের সাথে চলাফেরা করেন। লোকদেরকে এই বলে ধোঁকা দিতে চান, তিনি বৃদ্ধ নন। তিনি যুবতী মেয়েদেরকেও পরিপূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি দানে সক্ষম।

এই বুড়ো আমার সকল আবদার পূরণ করেন। এতদিন আমি তার সঙ্গে আক্রাতে ছিলাম। সেখানে হঠাৎ আমার সঙ্গে এক মুসলমান গোয়েন্দার সাক্ষাৎ হলো। সে গোয়েন্দা দামেশক থেকে এসেছিল।

'তার নাম কি?' চেঙ্গিস প্রশ্ন করলো।

'তার নাম শুনে তোমার কি লাভ?' মেয়েটি বললো, 'তুমি তো আর তাকে চেনো না। এখন আমার কথা শোন। তোমার ভালবাসা আমার মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছে। বলতে পারো আমার হৃদয়ের দুয়ারও খুলে দিয়েছে। আমি তোমার সামনে এমন গোপন তথ্য ফাঁস করছি, যার পরিণাম সোজা কারাগারে যাওয়া। যেখানে মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে করতে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি।'

চেঙ্গিস কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটি বললো, 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। দামেশকের সেই

গোয়েন্দা ধরা পড়েছিল। গ্রেফতার করার পর তাকে কারাগারের গোপন কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

আমি ছিলাম ক্ষমতাধর এক জেনারেলের প্রিয় আশ্রিতা। আমি আমার মুনীবের কাছে সেই গোয়েন্দাকে দেখার আবদার করলাম। যথারীতি সে আবদার মঞ্জুর হলো। গোয়েন্দার তামাশা দেখার জন্য আমি কারাগারের গোপন কক্ষে গেলাম। তাকে এমন কঠিন ও বর্বরোচিত শাস্তি দান করা হচ্ছিল যে, দেখে আমার মূর্ছা যাওয়ার দশা। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, 'তার অন্য সাথীরা কোথায়, আর সে এ যাবত কি কি তথ্য যোগাড় করেছে।'

তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। চেহারা নীল হয়ে উঠেছিল। তবুও সে বলছিল, 'আমার শরীরে এক মুসলমান পিতার রক্ত বইছে। আমাকে মেরে ফেলতে পারবে, কিন্তু আমি গাদ্দারী করতে পারবো না।'

সহসা আমার যেন কি হয়ে গেল। এতদিন পর হঠাৎ করেই আমারও মনে পড়ে গেল, আমার শিরায়ও তো এক মুসলিম পিতারই রক্ত বইছে! আর এ কথা মনে হতেই জেগে উঠলো আমার আপন সত্তা। আমার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। গোয়েন্দার গায়ের প্রতিটি আঘাত মনে হলো আমারই শরীরে পড়ছে। লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে আমি কাঁপতে লাগলাম। সবাই ভাবলো, আমি দুর্বল চিত্তের মেয়ে মানুষ। সে কারণে আমি ওই অত্যাচার দেখে ভয় পেয়েছি।

ওরা আমাকে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরিয়ে নিল। কিন্তু

তখন আমার প্রতিটি রক্ত কণিকায় যেন ভূমিকম্প হচ্ছিল। মরু সাইমুমের মত তোলপাড় করছিল হৃদয়। আমি সংকল্প করলাম, যে করেই হোক, এই মুসলমান গোয়েন্দাকে আমি কারাগার থেকে মুক্ত করবোই।

আমি আমার সবটুকু বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে একত্রিত করলাম। আমার মালিকের পদমর্যাদা ও ক্ষমতাকে কাজে লাগালাম। আমার রূপ ও সৌন্দর্যের যাদু ব্যবহার করলাম। আর কয়েক টুকরো সোনা ব্যবহার করলাম তার মুক্তির জন্য।

তারপর একদিন সকালে আমার মালিকের মুখে শুনতে পেলাম, কারাগারের গোপন কক্ষ থেকে সেই মুসলমান গোয়েন্দা পালিয়েছে।

আসলে সে তখনো কারাগার থেকে পালাতে পারেনি। আমি তাকে সেখান থেকে বের করে উপরের গুদাম ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর শহরে তাকে খোঁজাখুজি শেষ হলে আমি আমার এক মুসলমান চাকর দিয়ে গোপনে তাকে ওখান থেকে বের করে আনি।

তার অবস্থা তখন খুবই কাহিল ছিল। আমি তাকে শহরেই এক জায়গায় লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করলাম।

সেও তোমার মত এক সুন্দর যুবক ছিল। কয়েদখানা তাকে লাশ বানিয়ে দিয়েছিল। আমি তার চিকিৎসার জন্য এক ডাক্তার নিয়োগ করলাম। ডাক্তার তার ক্ষতগুলো ধুয়ে সেখানে পট্টি বেঁধে দিল। তাকে শক্তি ও বল ফিরে পাওয়ার ঔষধ দিল। আমি রাতে গোপনে তার কাছে যেতাম। তার জন্য

ভাল ভাল খাবার ও ফলমূল নিয়ে যেতাম।

সেই যুবক জানতে চাইল, 'কেন তুমি আমার জন্য এতসব করছো?'

তখন আমি তাকে বললাম, 'আমিও এক মুসলমানের মেয়ে। আমার ঈমানই আমাকে এই দুঃসাহসিক কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে।'

আমার জবাব শুনে সেই যুবক আমার ঈমানের প্রদীপকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দিল। সে আমাকে শোনালো বিবি খাওলা ও আরো মহিয়সী মহিলাদের ত্যাগের কাহিনী।

আমিও আমার জীবন ইতিহাস তাকে শুনিয়ে দিলাম, যেমন আজ তোমাকে শুনাচ্ছি। সে আমাকে বলল, 'আমার সাথে চলো।'

আমি তাকে বললাম, 'না, তুমি আমাকে দোয়া করো, গোয়েন্দাগিরীর যে বিদ্যা আমি শিখেছি তা যেন আমার জাতি ও ধর্মের জন্য কাজে লাগাতে পারি।'

তখন সে আমাকে আক্রার তিন জন লোকের নাম বলল। বলল, 'যদি কখনো বিপদে পড়ো এই তিনজনের যে কারো কাছে খবরটা দিও। আর কোন খবর থাকলে, তাও ওদের কাছে পাঠাতে পারো।'

পরে সে ওই তিনজনের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থাও করেছিল। এই গোয়েন্দা যখন সুস্থ্য হয়ে উঠলো, তখন সে শহর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার যাওয়ার পর আমি গোপনে তার সাথীদের সাথে দেখা

করতে লাগলাম। তারা আমাকে গোয়েন্দাগিরীর আরো কায়দা কানুন শিখিয়ে দিতে লাগলো। এভাবেই আমি তাদের দলে শামিল হয়ে গেলাম এবং তাদেরই একজন হয়ে কাজ করতে লাগলাম।

আমার মালিক এক উঁচু সামরিক অফিসার ছিল বলে সহজেই আমি শহরের অভিজাত মহল এবং বড় বড় আমীর ও অফিসারদের সাথে মিশতে পারতাম। তাছাড়া আমার অনুপম সৌন্দর্য ও যৌবনের আকর্ষণে সকলেই আমার সাথে সখ্যতা করতে আগ্রহী ছিল। সতীত্ব আমি আরো আগেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। এবার চোখের ইশারায় বড় বড় রথী-মহারথীদের ঘায়েল করার কাজে নেমে পড়লাম আমি।

পাপিষ্ঠদের আঙ্গুলের ইশারায় নাচিয়ে আমি ওদের বন্দী করতে লাগলাম আমার রূপের জালে। কাউকে কাউকে আশ্বাস দিলাম, মালিককে বলে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দেবো। এভাবে সখ্যতা গড়ে তাদের কাছ থেকে অনেক মুল্যবান ও গোপন তথ্য আমি বের করে আনতাম আর তা পাঠিয়ে দিতাম সেই তিন মুসলিম গোয়েন্দার কাছে।

তারা আমাকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে নানা কথা শুনাতো। তাদের কাছ থেকে আইয়ুবীর গল্প শুনে আমার মনে হতো, লোকটা মানুষ নয়, ফেরেশতা।

আমার অন্তর সেই ফেরেশতাকে এক নজর দেখার জন্য আনচান করতে লাগল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাকে এক নজর চোখের দেখা দেখারও সৌভাগ্য আমার হলো না। তিনি

জানতেও পারলেন না, জাতির জন্য তিনি একাই লড়ছেন না, আমার মত পাপিষ্ঠারাও সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তারপর আমি আমার মালিকের সাথে এখানে এসে গেলাম। জানতে পারলাম, ক্রুসেড বাহিনী সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের উপর সামরিক অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আমি আমার মালিক এই জেনারেলের কাছ থেকে তাদের সমস্ত গোপন তথ্য জেনে নিলাম। এসব তথ্য এখন কায়রো পাঠানো দরকার। কিন্তু এখানে আইয়ুবীর কোন গোয়েন্দার সাথে আমার পরিচয় নেই। তাই আমি নিজেই এসব তথ্য নিয়ে কায়রো ছুটে যেতে চাই। তোমার কাছে আমার ভালবাসার দোহাই, তুমি শুধু একবার আমাকে এখান থেকে বেরোনোর সুযোগ করে দাও। এর বিনিময়ে তুমি আমার কাছে যা চাবে, তাই পাবে। সারা জীবন আমি তোমার কেনা বাঁদী হয়ে থাকবো। আর কোনদিন আমি গোয়েন্দাগিরী করবো না। তোমার কাছে ওয়াদা করছি, সারা জনম আমি তোমার সেবাদাসী হয়ে কাটাবো। শুধু একবার তুমি আমাকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দরবারে পৌঁছার সুযোগ করে দাও।'

মেয়েটির কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছিল সীমাহীন অনুনয়। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল রাশেদ চেঙ্গিস।

'তুমি এই গোপন তথ্য কোন সাহসে ফাঁস করে দিলে?' চেঙ্গিস বললো, 'যদি তুমি সত্যিই গোয়েন্দা হয়ে থাকো তবে তুমি এক আনাড়ী গোয়েন্দা। তুমি এক যুবকের ভালবাসার

উপরে ভরসা করে এমন কাজ করেছো, যা কোন গোয়েন্দা করে না। যদি আমি তোমাকে বলি, আমি তোমার চেয়ে ক্রুশকেই বেশী ভালবাসি, আর আমার আনুগত্য ক্রুসেড বাহিনীর ওপর, তখন তুমি কি করবে? বুদ্ধিমান গোয়েন্দা তার দায়িত্বের ওপর সন্তানের ভালবাসাকেও কোরবানী করে।'
'আমি যদি তোমার কাছে সত্য কথা প্রকাশ করে দেই, তবে কি তুমি মানবে, আমি আনাড়ী নই?' মেয়েটি বললো, 'আমি প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম, তুমি খৃস্টান নও। তুমি মুসলমান এবং মিশরের গোয়েন্দা।'
রাশেদ চেঙ্গিস এমন আঁৎকে উঠলো, যেন গোখরো সাপে তাকে দংশন করেছে। তার চোখ থেকে মদের নেশা আর ভালবাসার আবেগ সবই উড়ে গেল। সেখানে এসে জমাট বাঁধল ভয় ও শঙ্কার পাহাড়। সেই পাহাড়ের নিচে তলিয়ে গেল রাশেদ চেঙ্গিস নামের এক গোয়েন্দা। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চোখে সে তাকাল মেয়েটির দিকে। কিছু বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু অনুভব করলো, তার জবান বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুই বলতে পারছে না সে।
মেয়েটির চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেল সে। হাসি থামিয়ে মেয়েটি বললো, 'আমি কি আনাড়ী?'
এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব ছিল না চেঙ্গিসের পক্ষে। মেয়েটি যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকে তবে তার কাছে পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়াটা তেমন ভয়ের নয়। কিন্তু যদি মেয়েটি মিথ্যে বলে থাকে, তবে এই মেয়ের কাছে পরিচয় দেয়া, বা

না দেয়া কোন ব্যাপার নয়। ব্যাপার হলো, সে নিজে এতটাই আনাড়ী যে, দুশমন পক্ষের এক নারীর কাছে সে ধরা খেয়ে গেল।

যদি মেয়েটি মিশরের গোয়েন্দা হয়ে থাকে তবে তো তারা একই দলের লোক। সে ক্ষেত্রে এই মেয়ে তার কাছে অপরিচিত থাকার কথা নয়! কিন্তু মেয়েটির সাথে তার সে রকম কোন পরিচয় তো হয়নি!

মেয়েটি যে দলেরই হোক, সে যে এক ঝানু গোয়েন্দা, এ কথা অস্বীকারের কোন উপায় ছিল না চেঙ্গিসের। তার ভয় হলো, এ মেয়ে তো আবার দু'মুখো সাপ নয়! মেয়েটি দু'দিকের চর হয়ে দু'দিকেই খেলছে, এমনও তো হতে পারে! সে ভাল করেই জানতো, সুলতান আইয়ুবী গুপ্তচরবৃত্তিতে কোন নারীকে ব্যবহার করতে কড়া ভাবে নিষেধ করেছেন। মুসলিম গোয়েন্দারা বড়জোর বিশেষ প্রয়োজনে কোন নারীর সহযোগিতা নিয়েছে, এর বেশী নয়।

এমনও তো হতে পারে, মেয়েটা তার নিজ স্বার্থেই গোয়েন্দাগিরী করছে। যদি তাই হয় তাহলে তো এ মেয়ে কাল নাগিনীর চেয়েও বিষাক্ত! সাপকে হয়তো পোষ মানানো যাবে, কিন্তু দু'মুখো সাপের স্বভাব মেয়েকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। এরা যখন তখন এবং যে কোন দিকে ছোবল হানতে পারে।

'চুপ হয়ে গেলে যে!'মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'বলো, আমি কি মিথ্যা বলেছি?'

'হ্যাঁ! তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছো।' চেঙ্গিস উত্তর দিল, 'তুমি আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছো।'

'কেমন বিপদ?' মেয়েটি বললো।

'ভাবছি তোমাকে কি ধরিয়ে দেবো, নাকি ভালবাসার খাতিরে চুপ থাকবো।' চেঙ্গিস বললো, 'আমি জাত খৃস্টান এবং কট্টর ক্রুসেডার। যে কোন মূল্যে আমি ক্রুসেড বাহিনীর বিজয় চাই।'

তারা বাগানে ঘাসের ওপর বসে কথা বলছিল। মেয়েটি তার উরুর নিচ থেকে কিছু একটা বের করে চেঙ্গিসের দিকে মেলে ধরে বললো, 'এই নাও তোমার দাড়ি। কাল রাতেও যখন নেশায় ছিলে, তখন তোমার পকেটে দেখেছিলাম। আজ ভাবলাম, আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যদি দরকার হয়, তাই বের করে নিয়েছি।'

চেঙ্গিস মেয়েটির রূপের ফাঁদে আটকে গিয়ে নিজেকেই হারিয়ে বসেছিল। তাই মেয়েটি তাকে মদের নেশায় ডুবিয়ে দিয়ে তাকে আবিস্কারের জন্য কতদূর এগিয়ে গিয়েছিল, কিছুই সে টের পায়নি।

'আমি তোমার মুখে এক রাতে এই দাড়ি দেখেছিলাম।' মেয়েটি বললো, 'তুমি এই দাড়ি লাগিয়েই তোমার কামরা থেকে বের হয়েছিলে। আমি তোমাকে এই বাগানে এসে থামিয়ে দিলাম। তুমি তাড়াতাড়ি দাড়ি লুকিয়ে আমার সামনে এসেছিলে। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে তোমার জোব্বার দুই পকেটেই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছিলাম, তুমি খেয়াল করতে

পারোনি। তখনই আমি তোমার এই দাড়ির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কৃত্রিম দাড়িতে লেখা নেই যে, আমি এক গোয়েন্দা। তুমি কি করে আমাকে এক গোয়েন্দা ভাবতে পারলে?'

'তুমি যেমন করে আমার কাছে সৈন্যদের সম্পর্কে জানতে চাইলে, কেবল কোন গোয়েন্দাই তা চাইতে পারে।' মেয়েটি বললো, 'তুমি যেসব প্রশ্ন আমার কাছে করেছিলে, কোন গোয়েন্দা ছাড়া এসব জানার জন্য কেউ ব্যতিব্যস্ত হয় না। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কোন সৈনিকের মনেও এসব প্রশ্ন আসতে পারে না। আর মদ পান নিয়ে তুমি যে অভিনয় করলে, তাও কেবল কোন মুসলমানই করতে পারে। কোন খৃস্টানই মদ পান করাকে খারাপ জানে না, একমাত্র মুসলমানরাই তাকে হারাম জানে ও মানে।'

কথা বলতে বলতে মেয়েটি হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। সে চেঙ্গিসের চোখে চোখ রেখে তাকাল তার দিকে। তারপর দু'বাহু বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো? তোমার কি এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি এক মুসলমান? আমি কেমন করে তোমাকে আমার মন খুলে দেখাবো যে, আমরা দু'জন একই পথের যাত্রী। আমি তোমাকে শুধু সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা হিসেবেই আপন ভাবিনি। আমি জানি না, তোমাকে দেখার পর আমার মন কেন এমন উতলা হয়ে উঠলো। আমি তোমার সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য পাগল হয়ে গেলাম। যখন তোমার সাথে

আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন তোমাকে আমি খৃস্টানই মনে করেছিলাম। কিন্তু যখন টের পেলাম তুমি মুসলমান, আমার আনন্দের কোন সীমা রইল না। আমি আল্লাহর কাছে হাজার কোটি বার শুকরিয়া জানালাম।

রাশেদ, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমাদের আত্মা এক সাথে আকাশে উড়ছে। আর এখন এই মাটিতেও আমাদের আত্মা একাকার হয়ে আছে। আমি বিশ্বাস করি, কিয়ামতের দিনও আমাদের আত্মা আল্লাহ এক সাথে উঠাবেন এবং এক সাথে হাশর-নশর করবেন। বলতো, তোমাকে গোয়েন্দা প্রমাণ করার জন্য আর কতটি প্রমাণ উপস্থিত করবো?'

চেঙ্গিস পাথরের মূর্তির মত শক্ত হয়ে বসে রইল। মেয়েটির এ আবেগময় কথার পরও তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। মেয়েটিই আবার মুখ খুলল, 'আমি তোমাকে রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। আমি মনে করি, আজ এবং এখুনি এ স্থান আমাদের ত্যাগ করা দরকার। নইলে দু'জনের ওপরই বিপদ নেমে আসতে পারে।

আমাদের কাছে এখন যে তথ্য আছে সেগুলো মহা মূল্যবান সম্পদ। যদি এই সংবাদ সঠিক সময় কায়রোতে পৌঁছাতে না পারি তবে হারান, হলব, হিম্মত, দামেশক ও বাগদাদ ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণের প্লাবনে ভেসে যাবে। তখন মিশরকে রক্ষা করাও অসাধ্য হয়ে পড়বে।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এসব খবর কিছুই জানেন না। সময় আর বেশী নষ্ট করার উপায় নেই। আমি এখান থেকে

একা বেরোনোর সাহস পাচ্ছি না। পেলে তোমাকে আমি পীড়াপীড়ি করতাম না।

রাশেদ, তুমি বুঝতে চেষ্টা করো, তোমার সঙ্গ আমার কেন বিশেষ প্রয়োজন। আমি শহর থেকে বেরোনোর বুদ্ধিও চিন্তা করে রেখেছি। আমি তোমাকে নিয়ে শহরের বাইরে ভ্রমণে যাবো। তুমি হবে আমার রক্ষী। তখন কেউ আর আমাদের সন্দেহ করতে পারবে না।'

রাশেদ চেঙ্গিস নীরব ও নিথর হয়ে বসেছিল। মেয়েটি তার পিয়ালায় মদ ঢেলে পিয়ালাটি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবেগ মাখা কণ্ঠে বলল, 'তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছো। নাও, পান করে নাও। এটাই যেন তোমার জীবনের শেষ পিয়ালা হয়। এর পর আমরা তওবা করে ফিরে আসব এই পাপকর্ম থেকে।'

মেয়েটি পিয়ালা তার ঠোঁটে তুলে ধরলো। মদের নেশায় চুর হয়ে চেঙ্গিস বলে উঠলো, 'তুমি সত্যি এক অসামান্যা গুপ্তচর! নতুবা আজ দেড় বছর ধরে আমি ক্রুসেড গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হরমনের ছায়ায় কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চেনা তো দূরের কথা, সামান্য সন্দেহও করতে পারলেন না। আমি তোমার এই বিচক্ষণতার প্রশংসা করি। তুমি ঠিকই বলেছো, আমরা দু'জন একই লক্ষ্য পথের যাত্রী। তুমি সত্যি আমার সাথে কায়রো যাবে?'

'আমি তো সে কথাই তোমাকে বলছি। কখন রওনা করতে চাও?'

'আজ এবং এখুনি।'
'না, রাতের বেলা চোরের মত শহর ছাড়লে আমরা দুশমনের সন্দেহের তালিকায় পড়ে যাবো। আমি আমার মনীবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিই। তারপর তাকে বলবো, আমার একজন রক্ষীর প্রয়োজন। আমি রক্ষী হিসাবে তোমাকে আমার সাথে দেয়ার আবদার করবো। আমার মনীব কখনো আমার আবদার ফেলে না, আশা করি, কালও ফেলবে না। দিনের বেলা আমি গোছগাছে সময় কাটিয়ে দেবো। তারপর রাত নামলে, যখন সবাই আনন্দ অভিসারে বেরোবে, ঠিক সেই ফাঁকে আমরা শহর ত্যাগ করবো। কাল সন্ধ্যার পর তুমি এখানেই চলে এসো। আমি এর মধ্যে আরও কোন নতুন খবর নেয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখবো।'

০

রাতের শেষ প্রহরে রাশেদ চেঙ্গিস তার কামরায় পৌঁছলো। সে ভিক্টরকে আর জাগালো না। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই তাকে রাতের কাহিনী শোনাবে বলে মনস্থির করলো।
এটি ছিল তার জীবনের সবচে স্মরণীয় রাত। এক দিকে তার চিন্তার রাজ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি হয়েছিল মেয়েটির হাতে ধরা পড়ে গিয়ে। অন্যদিকে সে পরম আনন্দ ও খুশী অনুভব করছিল এই ভেবে, এক অসামান্যা মেয়ে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। মেয়েটি কেবল বুদ্ধিমতিই নয়, তার মতই এক গুপ্তচর এবং সে এক মুসলিম বাপের কন্যা।

বিছানায় শুয়ে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল আগামী কাল সকালের। কাল সূর্য উঠবে তার জীবনে নতুন খুশীর খবর নিয়ে। কি পরম সৌভাগ্য তার, কাল সে ত্রিপলী থেকে এক অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাবে।
কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে সুখস্বপ্ন দেখল রাশেদ চেঙ্গিস। তার মনে হলো, এখনি এ শুভ সংবাদটা ভিক্টরকে দেয়া দরকার। অধীর আগ্রহে সে তৎক্ষণাৎ ভিক্টরের কামরায় গিয়ে হাজির হলো।
ভিক্টর তাকে দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি বিছানায় উঠে বসলো। বললো, 'কি ব্যাপার, কোন দুঃসংবাদ?'
রাশেদ আনন্দে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'না বন্ধু, বলো পরম সুসংবাদ আছে।'
বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাল ভিক্টর। বলল, 'কি সুসংবাদ, শুনি?'
রাশেদ ভিক্টরকে মেয়েটির সাথে তার কথোপকথন এবং সমস্ত ঘটনাই বিস্তারিত জানালো।
'তুমি কি তাকে বলেছ, তুমি একজন গোয়েন্দা?' ভিক্টর জিজ্ঞেস করলো।
'হ্যাঁ!' চেঙ্গিস উত্তর দিল, 'আমাকে তা বলতেই হলো।'
'আমার সম্পর্কে কি কিছু বলেছো?'
'না।' চেঙ্গিস উত্তর দিল, 'তোমার সম্পর্কে কোন কথাই হয়নি।'
ভিক্টর মাথা নিচু করে চুপ হয়ে বসে থাকল। তাকে নীরব

থাকতে দেখে রাশেদ বললো, 'তুমি কি মনে করছো, আমি ভুল করেছি?'

'জানি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, মেয়েটা তাদেরই গোয়েন্দা।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, আমি এক অবুঝ ও আনাড়ী গোয়েন্দা! তার কাছে পরিচয় দিয়ে আমি ভুল করেছি?'

'তুমি ভালো শুধু এটাই করেছো যে, আমার নামটা তার কাছে বলোনি।' ভিক্টর বললো, 'এখন তুমি নিজেই ঠিক করো, তুমি আনাড়ী ও অবুঝ কি না।'

'আমি কি তাহলে সত্যি ভুল করে ফেলেছি!' চেঙ্গিস আপন মনেই বললো কথাটা।

'হয়ত হতেও পারে, তুমি বিরাট একটা ভাল কাজ করে ফেলেছো।' ভিক্টর বললো, 'আর যদি ভুলই করে থাকো তবে সেটাও কোন ছোটখাটো ভুল নয়। তুমি হয়তো ভুলেই গেছো, শুধুমাত্র একটি গোয়েন্দাই একটি সেনাদলের বিজয়ের কারণ হতে পারে। আর যদি ভুল হয়, তবে সে একাই তার দলকে ডুবিয়েও দিতে পারে। তুমি তো জানোই, সুলতান আইয়ুবী ক্রুসেড বাহিনীর এই বিরাট রণপ্রস্তুতি ও যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যদি আমরা ধরা পড়ে যাই, আর আমাদের সাথে এ গোপন সংবাদও কারাগারে বন্দী হয়ে যায়, অথবা আমরা যদি জল্লাদের হাতে পড়ে যাই, তবে যে সুলতান আইয়ুবী প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে আজও বিজয়ী বীর হিসেবে পরিচিতি হয়ে আসছেন, তিনিই একজন পরাজিত

সেনানায়ক হয়ে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করবেন।'

'না!' চেঙ্গিস আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়তার সাথে বললো, 'সে আমাকে ধোঁকা দেবে না, দিতে পারে না। সে এক মুসলিম মেয়ে। আমি কথা মত আজ রাতেও তার কাছে যাবো। সে আরও গোপন খবর নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে। এখন আর আমার ইমাম সাহেবের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই তথ্য এখন আমরা নিজেরাই কায়রোতে নিয়ে যাবো। আমার সাথে থাকবে আমার হৃদয়ের রাণী। সে-ই আমাকে শহর থেকে বেরোনোর পথ পরিষ্কার করে দেবে। আমরা এমনভাবে শহর ছাড়বো, যেন কারো মনে কোন সন্দেহ না জাগে। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ যেন একথা না ভাবে, আমিই এখানকার ক্রুসেড বাহিনীর গোপন খবর নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি বরং প্রচার করে দিও, আমাদের দু'জনকে গোপনে মেলামেশা করতে দেখেছো। সম্ভবত মেয়েটি ছেলেটিকে নিয়ে জেরুজালেম পালিয়ে গেছে।'

ভিক্টর গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। রাশেদ চেঙ্গিস ঢুলুঢুলু চোখে শুতে গেল তার কামরায়।

যে সময় চেঙ্গিস ভিক্টরের কামরায় প্রবেশ করছিল, ঠিক সেই সময় তার থেকে একটু দূরে ক্রুসেড বাহিনীর অফিসারদের আশ্রয় ক্যাম্পে গিয়ে প্রবেশ করলো মেয়েটি। সে ক্যাম্পের এক তাবুতে ঘুমিয়ে থাকা একটি লোককে জাগিয়ে তুলল। লোকটির ঘুম ভাঙছিল না দেখে মেয়েটি লোকটির পা ধরে

জোরে টান দিল। অবশেষে লোকটি হতচকিত হয়ে উঠে বসলো।

মেয়েটি হেসে বললো, 'আমি শিকার ধরে ফেলেছি।'

সে লোক মেয়েটিকে তার বাহুতে জড়িয়ে নিয়ে বললো, 'বলো, কি সংবাদ এনেছো।'

'সে সত্যিই গোয়েন্দা।' মেয়েটি বললো, 'এবং সে মুসলমান।'

'হরমনের সন্দেহটা তাহলে সত্যে প্রমাণিত হলো?'

'সম্পূর্ণ সত্য।' মেয়েটি বললো, 'মদের নেশা ও আমার রূপের যাদুর কেরামতি দেখো। যাকে হরমনের মত উস্তাদ গোয়েন্দাও সনাক্ত করতে পারেনি, আমি সেই অসাধ্য সাধন করেছি।'

'সত্যি, তোমার কোন তুলনা হয় না সুন্দরী।'

'তার নকল দাড়িটা আমার হাতে না পড়লে আমিও হয়তো নাকাল হতাম। অবশ্য তাকে আমি সেদিনই সন্দেহ করেছিলাম, যেদিন প্রথম সে মদ পান করতে অস্বীকার করলো। তখনি আমার সন্দেহ হলো, সে মুসলমান। আমি যখন তাকে বললাম, আমি পবিত্র ভালবাসার পিয়াসী, তখন সে আমাকে ভোগ না করে পবিত্র ভালবাসাই দিল। কোন খৃস্টান এটা করতো না। আমাদের লোক হলে প্রথমেই সে আমাকে উলঙ্গ করার চেষ্টা করতো।'

'ভালবাসা পবিত্র হোক বা অপবিত্র, মেয়েদের দেহটাই এমন কোমল যে, তা পাহাড়কেও গলিয়ে পানি করে দেয়।' লোকটি

বললো, 'এই দুর্বলতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম না, তোমার অনুপম দেহ সে লোকের মুখোশ খোলার জন্য যথেষ্ট। দেখলে তো, সে লোক ফেরেশতা হলেও তোমার জালে ধরা পড়তো।'

কথা বলছিল খৃস্টান গোয়েন্দা সংস্থার এক অফিসার, যে হরমনের সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিল। হরমনের কোন কারণে সন্দেহ হয়েছিল, রাশেদ চেঙ্গিস বোধ হয় গোয়েন্দা। এমনিতেই এ লোক ছিল বিচক্ষণ, তার ওপর তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যার ওপর সামান্য সন্দেহ হয় তাকেই গ্রেফতার করার। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি কড়া ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন।

রাশেদ চেঙ্গিস যে রাতে মসজিদে যায় সে রাতেই হরমন তার সহকারীকে বলেছিল, 'চেঙ্গিসের পিছনে মেয়ে লাগাও। দেখো, সে আসল না নকল! ভেজাল না খাঁটি।'

ক্রুসেডের গোয়েন্দা বাহিনীতে এ কাজের জন্য অনেক সুন্দরী মেয়েই ছিল। হরমনের সহকারী এ মেয়েটিকেই বেছে নিল তাদের মধ্য থেকে এবং চেঙ্গিসের পিছনে তাকে লেলিয়ে দিল।

মেয়েটা ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথেই সে তার এতদিনের ট্রেনিং কাজে লাগাতে শুরু করে দিল। নারীর সহজাত ছলাকলায়ও সে ছিল খুবই পারদর্শী। সে চেঙ্গিসকে তার রূপের ফাঁদে আটকানোর নাটক শুরু করে দিল।

চেঙ্গিস কোনদিন সামান্য চিন্তাও করেনি, এমন ভয়াবহ ফাঁদে তাকে পড়তে হবে। সে যথারীতি ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য কামরা থেকে বেরিয়েছিল। অমনি মেয়েটা তাকে অনুসরণ শুরু করে এবং বাগানের নিরিবিলিতে তার পথ আটকে দাঁড়ায়।

এই মেয়েটা কোথায় থাকে, কেমন করে সে তার পথে বের হওয়ার খবর পায়, এসব চিন্তা একবারও চেঙ্গিসের মনে পড়েনি। সে সহজেই মেয়েটিকে বিশ্বাস করে এবং তার খপ্পড়ে পড়ে যায়।

'আমি তাকে তোমার শেখানো হৃদয় বিদারক কাহিনীটি এমনভাবে শুনালাম যে, তাতেই সে বুদ্ধু কাবু হয়ে গেল।' মেয়েটি হরমনের সহকর্মীকে বললো, 'সে অবলীলায় বিশ্বাস করে নিল, আমি সত্যিই মুসলমান এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা।'

'মুসলমান জাতিটাই আবেগপ্রবণ!' হরমনের সহকর্মী বললো, 'এই জাতিটা এক অদ্ভূত ও বিস্ময়কর জাতি। এই জাতি ধর্মের নামে এমন এমন কোরবানী দিয়ে থাকে, যা অন্য জাতি দিতে পারে না। যুদ্ধের ময়দানে এক মুসলমান দশ, কখনও পনেরো বিশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে জয় লাভ করে। কখনো জয় লাভ করতে না পারলে শহীদ হয়ে যায়, কিন্তু পিছু হটে না। একেই তারা বলে ঈমানের শক্তি। আমি মুসলমানদের এই রূহানী শক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না।

মাত্র আট দশ জনের একটি কমাণ্ডো গ্রুপ অতর্কিতে আমাদের বিশাল বাহিনীতে ঢুকে পড়ে, রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আমাদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়, আমাদের রসদপত্র, খাদ্যশস্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্য থেকে চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে বেরিয়ে যায়, নিজেদের লাগানো আগুনে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়– এটা কোন সহজ কথা নয়। এটা অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের ব্যাপার! এই সাহস ও শক্তি আসে আধ্যাত্মিক প্রেরণা থেকে। এই আধ্যাত্মিক প্রেরণাকেই বলে মোজেযা।

মুসলমানদের এই শক্তি দুর্বল করার জন্য আমাদের বুদ্ধিজীবীরা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিভিন্ন উপায় বের করছে মুসলমানদের ধর্মীয় উন্মাদনাকে দুর্বল করার জন্য। এ ক্ষেত্রে ইহুদীরা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আমরা সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করে এ ক্ষেত্রে কিছুটা সফলতাও লাভ করেছি।

আমরা কয়েকজন ইহুদী ও খৃস্টানকে মুসলমান আলেম ও ইমামের ছদ্মবেশে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছি। মুসলিম এলাকার বেশ কিছু মসজিদের ইমাম এখন ইহুদী ও খৃস্টান। তারা কোরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও তাফসীর পেশ করে। আর এ কাজটা এমন ভাবে করে, যা জনমনে গভীর রেখাপাত করে। এভাবে মুসলমানরা ভুল বিশ্বাসের শিকার হয়ে যাচ্ছে। জিহাদকে তারা এখন ধর্মীয় গোড়ামী বলে বুঝতে শিখছে। তাদের নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে

যাচ্ছে। আঞ্চলিকতা ও ধর্মীয় ফেরকাগত পার্থক্যকে অবলম্বন করে এখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দৃষ্টান্তও তুলে ধরছে।' থামল সহকারী।

মেয়েটি বলল, 'আর আমরা বুঝি বসে আছি? আমাদের সাফল্যের দিকটাও বুঝতে চেষ্টা করো। আমরাই তো মুসলমানদের মধ্যে যৌন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছি। এখন যে সকল মুসলমান ধনসম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাদের প্রথম কাজ হয় সুরক্ষিত অন্দর মহল বা হেরেম তৈরি করা। সেখানে সুন্দরী মেয়েরা তাদের হেরেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। এই নারী পূজা এখন মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করে গেছে। তোমরা মুসলমান মেয়েদের মধ্যে প্রসাধনী ও বিলাসিতার রোগ ছড়িয়ে দিতে যথার্থই সক্ষম হয়েছো। তাদের সময় ও অর্থ এখন এতেই অপচয় হয়।'

'মুসলমানরা তো এমনিতেই আবেগময়।' বললো মেয়েটি। 'তাদের চেতনায় একটু আবেগের ঝড় তুলতে পারলেই তাদের জালে ফেলে যায়। তাদের এই আবেগপ্রবণতা ও তোষামোদপ্রিয়তাকে এখন কাজে লাগাতে হবে।'

'হরমন সাহেব বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এ জাতি কল্পনাবিলাসী ও গোলাম জাতিতে পরিণত হয়ে যাবে।' বললো হরমনের সহকারী। 'তারা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। তখন আর আমাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কিংবা মহাসমরের প্রয়োজন পড়বে না। মুসলমানরা মানসিক দিক থেকেই

আমাদের দাস হয়ে যাবে। তারা তাদের ঐতিহ্য ভুলে আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে থাকবে। এমনকি আমাদের কালচারকে ধারণ করতে পেরে নিজেরা গর্ববোধ করবে।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।' মেয়েটি বললো, 'আমি তো তোমাকে মস্তবড় একটা শিকার ধরে দিলাম। এবার তাকে গ্রেফতার কর র ব্যবস্থা করো, আমি যাই।'

'না! গোয়েন্দা সংস্থার সহকারী প্রধান বললো, 'এখনও তোমার কাজ শেষ হয়নি। তাকে গ্রেফতার করার ইচ্ছা থাকলে এত নাটক করার কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে এত কষ্ট দেয়ারই বা কি দরকার ছিল! আমি তো যে কোন লোককে সন্দেহ মাত্র গ্রেফতার করতে পারি।'

'তাহলে আর এত কষ্ট দিলে কেন?'

'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। শোন, তাকে এখন গ্রেফতার করবো না। তার কাছ থেকে তার সমস্ত সঙ্গীদের সন্ধান নিতে হবে। যারা তাদের হয়ে ত্রিপলীতে গোয়েন্দাগীরি করছে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমার বিশ্বাস, এখানে তাদের ধ্বংসাত্মক কমাণ্ডো বাহিনীও আছে। তুমি এদের সন্ধান বের করতে পারলে দেখা যাবে, হয়তো অন্যান্য শহরের গোয়েন্দাদের তালিকাও পেয়ে যাবো তাদের কাছে।

তুমি তো তার সাথে আবার সাক্ষাতের সময় ঠিক করেই এসেছো। তখন তাকে বলবে, তুমি গোপন তথ্য সবই জেনে নিয়েছ। এখন তোমার কয়েকজন কমাণ্ডো প্রয়োজন। কারণ,

একস্থানে ক্রুসেড বাহিনীর অপরিমেয় আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও পেট্রোল জমা আছে। এগুলো জমা করা হয়েছে অভিযানের সময় সঙ্গে নেয়ার জন্য। পালাবার আগে এগুলো ধ্বংস করে যেতে পারলে ক্রুসেড বাহিনীর কোমর ভেঙে যাবে। তাই জীবন গেলেও এ কাজ সমাধা না করে তুমি কোথাও যেতে পারো না।'

'বুঝতে পেরেছি।' মেয়েটি বললো, 'কিন্তু এ ব্যাপারে একটি অসুবিধা আছে। সে তার সাথীদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করতে পারে।'

হরমনের সহকর্মী মেয়েটির নরম চুলে হাত বুলিয়ে বললো, 'তোমার দেহের অস্ত্রগুলো কি অকেজো হয়ে গেছে? সে তো তোমার কাছে তার সব কিছু উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তোমাকে এখন আরও ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। তার অন্তরের প্রতিটি কোণে তল্লাশী চালাতে হবে। একবার যখন তুমি তার ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছো, তখন এ কাজটিও পারবে। আমি সকালেই হরমনকে তোমার সাফল্যের বিস্তারিত কাহিনী জানাবো। বলবো, তুমি এক অসামান্য কাজ সম্পন্ন করে এসেছো।'

০

ঐ দিনই সন্ধ্যার পর। ভোজ সভায় চেঙ্গিস ও ভিক্টর ডিউটি করছে, এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন হরমন। তিনি চেঙ্গিসকে কাছে পেয়ে অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, 'তুমি কি

জানো, আমাদের বিশাল সম্মিলিত বাহিনী ইতিহাসের সবচে বড় যুদ্ধে যাত্রা করছে? অনেক্ দূরের পথ, দীর্ঘ লম্বা সফর। এই সফরে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন কয়েকজন সম্রাট। তাই আমি মনে করছি, তোমাকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো। ভিক্টরও যাবে তোমার সাথে।'

'আমি অবশ্যই যাবো!' চেঙ্গিস উৎসাহের সাথে বললো।

হরমনের কাছে এরই মধ্যে রিপোর্ট পৌঁছে গেছে যে, 'রাশেদ চেঙ্গিস একজন শত্রু গোয়েন্দা। গত রাতেই তাদের এক যুবতী গুপ্তচর তার মুখোশ উন্মোচন করেছে। আজও মেয়েটি তার সাথে মিলিত হবে এবং তার কাছ থেকে দলের অন্যান্য সঙ্গী সাথীর নাম উদ্ধারের চেষ্টা করবে।'

হরমন এ সংবাদে খুবই উৎফুল্ল হলেন। সহকর্মীকে বললেন, 'চেঙ্গিসের দলের পূর্ণ সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত মেয়েটি যেন এ অভিনয় অব্যাহত রাখে। ওকে এমন ভাবে মেলামেশা করতে বলবে, চেঙ্গিস যেন ওকে সন্দেহ করতে না পারে।'

আজ চেঙ্গিসের মন ছিল বিক্ষিপ্ত। সে ডিউটি করছিল ঠিকই, কিন্তু ডিউটির দিকে তার কোন খেয়াল ছিল না। বার বার তার মনে পড়ে যাচ্ছিল মেয়েটির কথা। সন্ধ্যার পর থেকে তার হৃদয় রাণী হয়তো তারই অপেক্ষায় বাগানে বসে ছটফট করছে। আজ সে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরই এ শহর তার পর হয়ে যাবে। উত্তেজনায় প্রতিটি মুহূর্ত তার কাটছিল ভয়ংকর অস্থিরতার মধ্যে।

তার জীবনে এত বড় সফলতা আর কখনো আসেনি। তার

কাছে এত গোপন তথ্য এসেছে এবং এমন সুন্দরী যুবতী তার জন্য জীবনের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে; যা সে কখনো কল্পনাও করেনি।

সে ভাবছিল, সত্যি কি আজকের রাতই ত্রিপলীতে তার জীবনের শেষ রাত! সে কি পারবে এই অমূল্য তথ্যরাজি নিয়ে কায়রো ফিরে যেতে! আল্লাহর কি অপূর্ব মহিমা! একেই বলে রাজ্য ও রাজকন্যা একত্রে পাওয়া।

মেয়েটিকে সঙ্গে করে ত্রিপলী থেকে বের হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সে দ্রুত তার ডিউটি শেষ করে কামরায় এলো। ভিক্টরও সঙ্গে এলো তার। সে তাড়াতাড়ি তার পোষাক পরিবর্তন করে প্রস্তুত হয়ে নিল। আজ আর কৃত্রিম দাড়ি সঙ্গে নিল না, তার পরিবর্তে একটা খঞ্জর জোব্বার মধ্যে লুকিয়ে নিল।

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি এখনও শেষ বারের মত বলছি, এই নারী ও মদের নেশা থেকে তুমি সাবধান হও।' ভিক্টর তাকে বললো, 'আমার কিন্তু তোমার ব্যাপারে ভীষণ ভয় হচ্ছে। তুমি মেয়েটাকে না চিনে কোন যাচাই-বাছাই না করে তোমার সমস্ত গোপন তথ্য তাকে দিয়ে দিয়েছ, এখন আবারও যাচ্ছ। কিন্তু সে তোমাকে জান্নাতে না জাহান্নামে নেবে তার কিছুই তুমি জানো না।'

'শোন ভিক্টর!' চেঙ্গিস গম্ভীর স্বরে বললো, 'আমি এই মেয়ের বিরুদ্ধে কোন কথাই শুনতে রাজী নই। আমি তার সাথে নতুন ও হঠাৎ সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি না। এর আগেও বহু বার মেয়েটির সাথে আমার দীর্ঘ সাক্ষাৎ হয়েছে। তার বেদনাময়

জীবনের পূর্ণ কাহিনী আমি শুনেছি। তুমি তাকে দেখোনি, তার সাথে কথাও বলোনি, তাই ওই মেয়েকে তুমি চিনতে বা বুঝতে পারবে না। আমাকে তুমি পাগল ভেবো না। আমার জীবনের এটাই প্রথম ও শেষ ভালবাসা।'

এরপর আর কথা বলা বৃথা ভাবলো ভিক্টর। তার কথায় বুঝা যাচ্ছে, সে আর স্বাভাবিক ও সুস্থ্য জ্ঞানে নেই। পতঙ্গ যদি দিওয়ানা হয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতেই চায়, তাকে ফেরায় সাধ্য কার! ভিক্টর চিন্তা করে দেখলো, চেঙ্গিসের মত এমন অনুপম সুন্দর যুবক যে কোন নারীর মন সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। কেবল সুঠাম দেহই নয়, নারীর মন ভুলানোর জন্য পুরুষের মধ্যে আর যেসব গুণ থাকা দরকার, তার সবই আছে চেঙ্গিসের মধ্যে। তার চোখের চাহনীতে আছে সম্মোহনী শক্তি, কণ্ঠে আছে মাধুর্য ও গভীরতা। ফলে এই মেয়ে কেন, এরচে আরও সুন্দরী ও অভিজাত ঘরের নারীও তাকে দেখে মজে যেতে পারে।

কিন্তু এই মেয়ে কি সত্যি তাকে দেখে প্রেমে পড়েছে, নাকি তার পেছনে এই মেয়েকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে? মেয়েটি নিঃসন্দেহে কোন সাধারণ মেয়ে নয়। যদি সে প্রেমেই পড়তো তবে সে চেঙ্গিসকে দেখেই নয়ন সার্থক করতো, তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সে যে এক গোয়েন্দা, এ তথ্য আদায় করতে যেতো না। ভিক্টরের দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েটি চেঙ্গিসকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে। আর যদি ধোঁকা না দেয় তবু চেঙ্গিস যা করছে তা ঠিক নয়। সে নির্বোধের মত তার গোপন পরিচয়

মেয়েটির কাছে উন্মুক্ত করে দিয়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেবল সে একা নয়, সে আমাদের সকলকেই বিপদের মুখে নিয়ে যাচ্ছে।

যদি এই মেয়ে মুসলিম গোয়েন্দাও হয়, তবুও তাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। কারণ, এই মেয়ে সে রকম কোন পরিচয় নিয়ে আমাদের কাছে আসেনি। ভিক্টর এই সাক্ষাতের মধ্যে কোন শান্তির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না।

চেঙ্গিস চলে গেল। ভিক্টর গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। প্রতিদিন চেঙ্গিসের যাওয়ার পর সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেত কিন্তু আজ রাতে সে শুতেও পারছে না, ঘুমও আসছে না। সে তার কামরায় গিয়ে শোয়ার পরিবর্তে অশান্ত ভাবে পায়চারী করতে লাগল।

০

মেয়েটি ঠিক সেই স্থানেই চেঙ্গিসের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তার পাশে মাটিতে মদের সুরাহী ও পেয়ালা। অন্ধকারে সে চেঙ্গিসকে আসতে দেখে দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো।

সে এমন ভাবে নিজেকে তার কাছে সঁপে দিল, তাতেই চেঙ্গিসের বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপায় হলো। ভিক্টরের কথায় তার মনে যদিও সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সন্দেহ এতেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

মেয়েটি তার যৌবনের যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করলো

চেঙ্গিসকে বিভ্রান্ত করতে। কিন্তু চেঙ্গিস পথে আসতে আসতে চিন্তা করছিল, সে মেয়েটিকে আবারও জিজ্ঞেস করবে, সে তাকে প্রতারণা করছে কিনা। সেই প্রশ্নটিই তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'তুমি তো আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ না?'

মেয়েটি অভিমানী সুরে বললো, 'এমন প্রশ্ন তুমি করতে পারলে! তোমার ভালবাসা আমাকে অসহায় ও নিরূপায় করে ফেলেছে। তোমাকে এত গোপন তথ্য দেয়ার পরও তুমি কি করে ভাবতে পারলে আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো?'

'দুঃখিত, আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি। আমার এক বন্ধু বললো, 'খবরদার, মেয়েদের বিশ্বাস করবি না। ওরা প্রেমের নামে এত ছলনা করতে জানে যে, ফেরাউনের গদিও তাতে উল্টে যায়।' তাই কথাটা তোমাকে বললাম।'

'বামুনের কাছে আঙুর ফল সব সময়ই টক। কারণ, সে তো আর কোনদিন তার নাগাল পাবে না!' মেয়েটি বললো, 'কি নাম তোমার সে বন্ধুর?'

'আরে রাখো তো! তার কথা বাদ দাও।'

মেয়েটি বন্ধুর নাম জানার জন্য আর পীড়াপীড়ি করলো না। তার কোমরে একটি বাহু জড়িয়ে তাকে সেখান থেকে মদের পাত্র ও পিয়ালার কাছে নিয়ে এলো। বললো, 'আমি কি আর জানি না, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করতে পারো না। আমি মন খারাপ করিনি, এসো বসি, গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।'

ওরা ঘাসের ওপর বসে পড়লো। মেয়েটি পিয়ালায় মদ ঢেলে তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'তোমার বিজয়ের আনন্দে

এক পিয়ালা।'
চেঙ্গিস এতই খুশী ছিল যে, বলার সাথে সাথেই পিয়ালা তুলে নিল ও মুখে নিয়ে পান করতে লাগলো। মেয়েটা তার পিয়ালায় আরও মদ ঢেলে দিল। চেঙ্গিস সেটুকুও পান করে নিল।

তারা যেখানে বসেছিল তার থেকে আট দশ গজ দূরে ফুলের একটা ঝাকড়া ঝোপ ছিল। কেউ একজন হামাগুড়ি দিয়ে সেই ঝোপের কাছে চলে এলো এবং তার আড়ালে বসে পড়ল।

রাত বাড়তে লাগল। চারদিক নীরব ও নিঝুম হয়ে গেল। বাগানের আঁধো আলো-আঁধারীতে বসে গল্প করছে ওরা। ঝোপের পেছনে বসা লোকটি কান লাগিয়ে শুনছিল চেঙ্গিস ও মেয়েটির কথা। তারা দু'জন জানে, আশেপাশে কেউ নেই। তাই কোন লুকোচুরি না করে স্পষ্ট স্বরেই তারা কথা বলছিল।

'এখন বলো, কি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের কথা বলছিলে?' চেঙ্গিস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো।

'এমন গোপন তথ্য নিয়ে এসেছি, সুলতান আইয়ুবী কখনও স্বপ্নেও এমন সংবাদ শুনেননি।' মেয়েটি বললো, 'আমি খৃস্টানদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।'

সে চেঙ্গিসকে ক্রুসেডদের আক্রমণের প্ল্যান ও অভিযানের রাস্তা বলে দিল। আরও বললো তারা কোথায় কোথায় আক্রমণ চালাবে। সে ক্রুসেড বাহিনীর রসদপত্র পাঠানোর রাস্তাও বলে দিল এবং কত তারিখে সমরাভিযান শুরু হচ্ছে

তাও বলে দিল।

'আমি এখান থেকে জলদি বের হয়ে যেতে চাই।' চেঙ্গিস বললো, 'চলো আজ রাতেই আমরা বের হয়ে যাই?'

'না!' মেয়েটি বললো, 'আমার কাছে আরো কিছু গোপন খবর আছে। সেটুকুও শুনে নাও, তারপর সিদ্ধান্ত নাও কি করবে?'

'কি সেই খবর, জলদি বলো!'

'আরে, এত উতলা হচ্ছো কেন? অস্থিরতা আমাদের শত্রু। যা করতে হবে সব ভেবে-চিন্তে করতে হবে, এত উতলা হলে চলবে না।' মেয়েটি বললো, 'তুমি তো জানোই, খৃস্টানদের ব্যাপারে আমার মনে প্রতিশোধের কি আগুন জ্বলছে। সে আগুন ঠাণ্ডা করার একটা উপায় পেয়ে গেছি। আমি ভাবছি, যাওয়ার আগে তাদের পায়ে একটা মরণ কামড় দিয়ে গেলে কেমন হয়?'

মেয়েটি চেঙ্গিসের মনযোগ আকর্ষণ করে বললো, 'ক্রুসেড বাহিনী তাদের সৈন্যদের জন্য অপরিমেয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে একখানে গুদামজাত করে রেখেছে। শুধু খাদ্যশস্য নয়, যুদ্ধের যাবতীয় তাঁবু এবং অস্ত্রশস্ত্রও সব সেখানে জড়ো করা। সেখানে তীর ধনুক ছাড়াও আছে অঢেল আগ্নেয়াস্ত্র। আছে পেট্রোলের ড্রাম। বলতে গেলে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যে বিশাল বাহিনী রওনা হচ্ছে, তাদের সমুদয় মাল-সামান ও অস্ত্র জমা করা হয়েছে সেখানে। এগুলো ধ্বংস করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়! সেখানে মাত্র সাত-আট জন সিপাহী রাতে পাহারায় থাকে।

আমি যতদূর জানতে পেরেছি, তা হলো, প্রায় তিন-চার মাস ধরে খৃস্টানরা এগুলো জমা করছে। যদি আমরা এগুলো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি তবে ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণ অন্তত ছয় মাস পিছিয়ে যাবে। কারণ পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে এবার খৃস্টানরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মুখোমুখি হবে না। আর যুদ্ধ ছয় মাস পিছানো মানে, সুলতান আইয়ুবী আরো ছয় মাস সময় পেয়ে যাবেন তাঁর বাহিনী ভাল ভাবে গুছিয়ে নেয়ার জন্য। কি বলো, আমি ঠিক চিন্তা করিনি?'

'কিন্তু...' ভাবনায় পড়ে গেল চেঙ্গিস। মেয়েটিই আবার মুখ খুলল। বলল, 'তুমি তো হরমনকে ভাল করেই জানো। ক্রুসেড গোয়েন্দা বাহিনীর তিনি প্রধান। আমি তার অন্তর থেকেও গোপন তথ্য বের করে নিয়েছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, সুলতান আইয়ুবী নতুন সেনা ভর্তি শুরু করেছেন। কারণ তার আগের সৈন্যরা গৃহযুদ্ধে লড়েই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অনেকে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। এখন তার যুদ্ধ করার কোন শক্তি নেই।

অভিশপ্ত ক্রুসেড বাহিনী এই সুযোগটাই গ্রহণ করতে চায়। নইলে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়ার সাহসই হতো না ওদের। এখন যদি আমরা ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণকে পিছিয়ে দিতে পারি, তবে আমাদের বিজয় অর্জন আরো সহজ হবে। আর এর একমাত্র উপায় তাদের অস্ত্র ও রসদ জ্বালিয়ে দেয়া। তাদের যে হাজার হাজার ঘোড়া এখানে জড়ো করেছে,

সেগুলোকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা।'

'তাদের রসদপত্রে আগুন কে লাগাবে?' চেঙ্গিস জিজ্ঞেস করলো।

'কেন, আমরাই লাগাবো! এখানে কি আমাদের লোকজন নেই? কোন কমাণ্ডো গ্রুপ নেই?' মেয়েটি বললো, 'নিশ্চয়ই এখানে আমাদের কমাণ্ডো বাহিনী আছে। এ কাজ তাদের উপরই ন্যস্ত করা যায়। আর যদি তা না থাকে তবে আমাদেরকেই এ ঝুঁকি নিতে হবে। তুমি ভয় পাচ্ছো? আরে জীবনের কি দাম আছে, যদি তা জাতির প্রয়োজনেই না লাগলো!'

'না, এটা ভয়ের কথা নয়। সুলতান আইয়ুবীর নিষেধ আছে, শত্রু কবলিত এলাকায় কোন ধ্বংসাত্মক কাজ করা যাবে না। কারণ কমাণ্ডোরা ধ্বংসাত্মক কাজ করে এদিক-ওদিক পালিয়ে যেতে পারবে কিন্তু সাধারণ নিরীহ মুসলমানদের ভোগ করতে হবে তার শাস্তি।' চেঙ্গিস বললো, 'খৃস্টান বাহিনী মুসলমানদের বাড়ীতে ঢুকে পর্দানসীন মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে। অযথা মুসলিম ছেলে-বুড়োকে ধরে নির্যাতন করবে। তাই আমরা কমাণ্ডোদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে শুধু গোয়েন্দা আছে। তারা ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারবে ঠিকই, তবে তাদের সংগঠিত করার জন্য কিছু সময়ের দরকার।'

'কিন্তু বেশী সময় নেয়া ঠিক হবে না। যা করার আমাদের তাড়াতাড়িই করতে হবে।' মেয়েটি বললো, 'আমাদের

লোকজনকে কি কোথাও একত্রিত করা যায় না? সবাই মিলে বসে পরামর্শ করলে একটা না একটা রাস্তা বেরিয়ে আসবেই।'

'আমরা একটি মসজিদকে গোপন আড্ডাখানা বানিয়ে নিয়েছি।' চেঙ্গিস মদের পাত্রে চুমুক দিয়ে বললো, 'সেই মসজিদের ইমাম আমাদের এখানকার দল নেতা। তিনি খুবই যোগ্য ও সাহসী ব্যক্তি! আমি আজ রাতেই তার সাথে দেখা করবো। তাকে সব কথা খুলে বললে তিনিই এ অভিযানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। দলের আর যে সব যুবক আছে, তারা নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে চলে আসবে। নামাজের পর সাধারণ মুসল্লীরা চলে গেলে আমরা সেখানেই অথবা ইমাম সাহেব যদি কোন গোপন জায়গা বের করতে পারেন সেখানে এই পরামর্শ সভা করতে পারি।'

'হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিক বুদ্ধি বের করেছো। তবে আমি ভাবছি, যদি দলে তেমন যোগ্য লোক থাকে তবে এ অপারেশনের আগেই আমাদের শহর ছাড়তে হবে। নইলে ক্রুসেড বাহিনীর বেপরোয়া তল্লাশীর ঝামেলায় পড়ে যেতে হবে। আর যদি না থাকে তবে প্রয়োজন হলে এ অভিযানের নেতৃত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। খুব সাবধানতার সাথে সুপরিকল্পিত উপায়ে এগুতে হবে আমাদের। তুমি কি মনে করো তোমাকে ছাড়া এ অভিযান সফল করার মত যোগ্য লোক এখানে আছে?' বলল মেয়েটি।

'ইমাম সাহেব নিজেই একজন যোগ্য লোক।' চেঙ্গিস বললো,

'এ ছাড়া এখানে আরও এমন কয়েকজন সাহসী ও বীর গুপ্তচর রয়েছে, যাদের কমাণ্ডো ট্রেনিং রয়েছে।' সে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করে বললো, 'ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য এ কয়জনই যথেষ্ট।'

'তাহলে এদের সবাইকে মসজিদের পরামর্শ সভায় ডাকো। শত্রু এলাকায় বার বার সভা করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়।'

মেয়েটি চেঙ্গিসের কাছ থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে চাচ্ছিল, সে সব তথ্য তার মুঠোয় এসে গেল। মনে মনে নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল সে। সে আরো খুশী হয়ে উঠল এ জন্য যে, পুরো দলটিকে ফাঁদে ফেলার জন্য জাল পাতার কাজটিও সে করে নিল একই সাথে। সে আরো কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা সেই আশায় নতুন প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল। বলল, 'চেঙ্গিস, তুমি কিন্তু খুব হুশিয়ার থেকো। তোমাকে নিয়ে আমার খুব ভয় হয়। কারণ তুমি তো থাকো একেবারে বাঘের ঘরে। স্বয়ং খৃস্টান সম্রাটের নিরাপত্তা বাহিনীর পেটের মধ্যে। সত্যি, তোমার কোন তুলনা হয় না। সম্পূর্ণ একা এই শত্রুপুরীতে তোমার ভয় করে না?'

'ভয় করলে কি আর গুপ্তচর হওয়া যায়!' বলল চেঙ্গিস, 'তবে আমি একা নই, রাজ দরবারের চৌহদ্দীতেই আমার আরো বন্ধু আছে। তুমি ভিক্টরকে চেনো না, সেও আমাদের দলের একজন।'

'কি! ভিক্টরও?' মেয়েটি প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠে বললো, 'সে তো খৃস্টান!'

'হ্যাঁ!' চেঙ্গিস বললো, 'কেন তুমি কি আমাদের এ কৌশলের জন্য প্রশংসা করবে না? একজন খৃস্টান যে আমাদের দলের গোয়েন্দা হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাববে না ক্রুসেড গোয়েন্দা বাহিনী, কি বলো?'

মেয়েটি কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। এই অস্বাভাবিক খবরটি হজম করতে সময় লাগলো তার। শেষে মাথা তুলে বলল, 'এতক্ষণে একটি ভাল খবর দিলে। ওরকম একজন বন্ধু থাকলে আমি তো দিনের বেলায়ও তোমার সাথে দেখা করতে পারি! কাল আমি তোমার কামরায় যাবো। তুমি ঠিকই বলেছো, ভিক্টর যথেষ্ট যোগ্য ও চালাক লোক। সে যদি এ অভিযানের নেতৃত্ব নেয় তবে আমরা নিশ্চিন্তে শহর ছেড়ে রওনা দিতে পারবো। আমি কালই তোমার কামরায় তার সাথে কথা বলতে চাই। আমি তোমার কামরায় গেলে সে আবার কিছু মনে করবে নাতো?'

'আরে না! ও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' বলল চেঙ্গিস।

০

মেয়েটি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। ঝোপের পেছনে লুকানো মানুষটি নড়ে উঠলো। সে বসা অবস্থায়ই কোমরের খাপ থেকে খঞ্জর বের করে নিল।

ওরা দু'জন বিদায় নিয়ে দু'দিকে হাঁটা ধরল। আট-দশ কদম এগিয়েছে মেয়েটি, পেছন থেকে একটি বাহু তাকে জড়িয়ে ধরল এবং চোখের নিমেষে তার হাতের খঞ্জরটি তার বুকে

বসিয়ে দিল। মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। বলে উঠল, 'হায়! আমার বুকে কে যেন খঞ্জর ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়াল চেঙ্গিস। দেখতে পেলো একটি লোক মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। সে দ্রুত হাতে তার খঞ্জর বের করে ছুটল আগন্তুককে আঘাত করতে। কাছে যেতেই লোকটি ঘুরে সেই মেয়েকে সামনে রাখলো আর বলে উঠলো, 'চেঙ্গিস! আমি ভিক্টর, তোমার সঙ্গী! এই হতভাগী কালনাগিনী এমন সব তথ্য পেয়ে গেছে যে, এর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

মেয়েটির প্রাণ তখনো বের হয়নি। ভিক্টর বুক থেকে তার খঞ্জরটি টেনে বের করে আনতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সেই রক্ত গিয়ে আঘাত করল চেঙ্গিসের চোখে মুখে। ভিক্টর শক্ত করে মেয়েটিকে পেছন থেকে ধরে রেখেছিল।

'খৃস্টানের বাচ্চা খৃস্টান!' চেঙ্গিস হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করে বকছিল, 'তুই শেষে কাল সাপ হয়ে আমার ভালবাসাকে দংশন করলি?'

সে ঘুরে ভিক্টরের ওপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করল। ভিক্টর মেয়েটিকে ঢাল হিসেবে সামনে রেখে বললো, 'স্বাভাবিক হও চেঙ্গিস! নেশার কবল থেকে ফিরে এসো। স্বপ্ন ও কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতে আসো। বুঝতে চেষ্টা করো কি ভয়ংকর ফাঁদে তুমি পড়েছিলে! তুমি এই মেয়েটার কাছে আমাদের সবার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছো। তুমি আমাদের সবার জন্য মহা বিপদ চাপিয়ে দিয়েছ। এই ডাইনী বেঁচে

থাকলে আগামী কালই আমরা সদলবলে গ্রেফতার হয়ে যেতাম। কেবল তুমি বা আমি নই, তার ষড়যন্ত্র সফল হলে এই ত্রিপলীতে আমাদের যত সদস্য কাজ করছে সবার ভাগ্যে কি অবর্ণনীয় বিপর্যয় নেমে আসতো তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার সৌভাগ্য যে, আমি এসে পড়েছিলাম এবং তোমাকে কারাগারের নির্যাতন সেল ও অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

চেঙ্গিস আহত চিতার মত তার চারদিক ঘুরে ঘুরে হুংকার দিচ্ছিল আর তাকে আঘাত করার চেষ্টা করছিল।

মেয়েটি তখনও জীবিত ছিল। সে কাতরাতে কাতরাতে বললো, 'চেঙ্গিস! আমার জান! আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমাকে সেবা করার সৌভাগ্য আমার হলো না। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমার কথা শোন, মনে রেখো, খৃস্টানরা কখনও আমাদের বন্ধু হতে পারে না! এ লোক আমাদের গোয়েন্দা নয়, এ নিশ্চয়ই ক্রুসেডদের গোয়েন্দা। যদি পারো আমার খুনের প্রতিশোধ নিও। বিদায় চেঙ্গিস!'

চেঙ্গিস সর্বশক্তি দিয়ে ভিক্টরকে আক্রমণ করলো। ভিক্টর বার বার তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো, 'চেঙ্গিস, তুমি মহা ভুল করছো। তুমি এক ছলনাময়ী নারীর ধোঁকায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছো। একজন গোয়েন্দা হিসাবে এর জালে পড়া কোন মতেই ঠিক হয়নি তোমার। তুমি জানো না, সুলতান আইয়ুবীর কড়া নির্দেশ আছে গুপ্তচরবৃত্তিতে মেয়ে ব্যবহার না করার? তাহলে এই মেয়ে কি করে আমাদের গোয়েন্দা হয়?

এখনো সময় আছে, এসো এই কালনাগিনীকে হত্যা করে লাশটি দূরে কোথাও ফেলে আসি।'

কিন্তু চেঙ্গিস তখন আর গোয়েন্দা ছিল না, সে ছিল এক দেওয়ানা প্রেমিক, যার প্রেয়সীকে অন্য এক পুরুষ ধরে রেখেছে। সে ছিল এক বীর পুরুষ ও যোদ্ধা, যার প্রেয়সীর বুকে খঞ্জর বিদ্ধ হওয়ায় সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

মেয়েটির জন্য সে ভিক্টরকে আঘাত করতে পারছিল না। যতবারই সে আঘাত করতে যাচ্ছিল ততবারই ভিক্টর মেয়েটিকে ঢাল বানিয়ে আত্মরক্ষা করছিল। সে আত্মরক্ষা করছিল আর চেঙ্গিসকে বুঝানোর চেষ্টা করছিল।

ভিক্টরকে আঘাত করতে না পেরে পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠল চেঙ্গিস। সে সামনে থেকে মেয়েটাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে, ভিক্টর পিছন দিকে পড়ে গেল। পড়ে গেলেও ভিক্টর মেয়েটিকে ছাড়েনি, মেয়েটিও তার বুকের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল।

চেঙ্গিস এই সুযোগটা নিল, সে ভিক্টরকে পাশ থেকে আঘাত করলো। কিন্তু ভিক্টর ছিল ঠাণ্ডা মাথার লোক। চেঙ্গিস যে মরিয়া হয়ে তাকে আঘাত করতে চেষ্টা করবে, এটা তার ভাল করেই জানা ছিল। সে একদিকে সরে কোন রকমে এ যাত্রা আত্মরক্ষা করলো।

কিন্তু চেঙ্গিস তাকে ছেড়ে দেয়ার মত পাত্র ছিল না। সে এবার উল্টো পাশে লাফিয়ে পড়ে খঞ্জরের এক ঘা বসিয়ে দিল

ভিক্টরের কাঁধে।
ভিক্টর এবার তার রূপ পাল্টাতে বাধ্য হলো। নিজেকে সামলে নিয়ে সেও পাল্টা আক্রমণ চালালো। সে ভাবতে বাধ্য হলো, চেঙ্গিসকে বাঁচিয়ে রাখাও এখন ভয়ের কারণ। ভিক্টরের খঞ্জরের আঘাত চেঙ্গিসের পিঠে লাগলো। চেঙ্গিস খঞ্জরের আঘাত খেয়ে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ভিক্টরকে আক্রমণ করলো। চেঙ্গিসের আঘাত ভিক্টরের বাহুতে লেগে কিছুটা ফেড়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে তার খঞ্জর সজোরে চেঙ্গিসের বুকে বসিয়ে দিল।
চেঙ্গিস একে তো মদের নেশায় মাতাল ছিল, তার ওপর অতিরিক্ত ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বেসামাল ছিল। ভিক্টরের এ আঘাতের ধকল সে সইতে পারল না, টলমল পায়ে কয়েক কদম পেছনে গিয়ে চেঙ্গিস মাটিতে পড়ে গেল। ভিক্টর মেয়েটির নাড়িতে হাত রাখলো। দেখলো তার প্রাণ স্পন্দন শেষ হয়ে গেছে। চেঙ্গিসের কাছে গেল সে। তারও তখন প্রাণ বায়ু বের হওয়ার পথে। না মরলেও তার তখন কোন জ্ঞান ছিল না।
ভিক্টরের কাঁধ ও বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। সে মেয়েটির ওড়না ছিঁড়ে তার বাহু ও কাঁধে পট্টি বেঁধে নিল, যাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ার তাড়া অনুভব করলো। সে সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য দ্রুত হাঁটা শুরু করলো।
ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধার পরও রক্ত পড়া বন্ধ হলো না। কিন্তু

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার সময় ছিল না ভিক্টরের, সে দ্রুত গতিতে বাগান থেকে বেরিয়ে এলো।

বাগান থেকে বেরিয়েই সে একটি চিপা গলির মধ্যে প্রবেশ করলো। দু'তিনটা মোড় ঘুরে এই গলি এক প্রশস্ত রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়েছিল। সে অন্ধকার গলি অতিক্রম করে বড় রাস্তায় চলে এলো।

তার ভাগ্য ভাল যে, তখন অনেক রাত। ত্রিপলী শহরের বাসিন্দারা গভীর নিদ্রায় বিভোর। সুনসান, নিস্তব্ধ সড়কের দু'পাশের প্রতিটি বাড়ীর গেট বন্ধ।

কিন্তু একটি ঘরের দরজা তখনো খোলা ছিল। সেই ঘর আল্লাহর ঘর। এই ঘরে কোনদিন ঢুকেনি ভিক্টর, তবে জানে মসজিদের ইমাম সাহেবের কামরার দরো'জা সব সময় কিছু লোকের জন্য খোলা থাকে। একটু ধাক্কা ব যুৎসই টোকা দিতে পারলেই তা খুলে যায়।

ভিক্টর এই প্রথম মসজিদে এলো। চেঙ্গিস বলেছিল, যদি কখনও ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করার প্রয়োজন হয়, তবে মসজিদের বারান্দায় চলে যাবে। বারান্দার বাম দিকের দেয়ালে একটি দরজা আছে, সেটিই ইমাম সাহেবের কামরার দরোজা।

ভিক্টর মসজিদের সিড়িতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেল, এই পবিত্র ঘরে ঢোকার সময় সবাইকে সে জুতা খুলে প্রবেশ করতে দেখেছে। সে তার জুতা খুলে হাতে নিল এবং বারান্দা পেরিয়ে ইমাম সাহেবের দরজার সামনে

গিয়ে দাঁড়াল।
এই মসজিদ ছিল ত্রিপলীতে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টার। আর মসজিদের ইমাম শুধু একজন ইমামই ছিলেন না, তিনি ত্রিপলীর গোয়েন্দা বিভাগেরও প্রধান।

o

রাত তখন অর্ধেকের বেশী পার হয়ে গেছে। ইমাম সাহেব গভীর নিদ্রায় ডুবে ছিলেন। দরোজার টোকা তাকে জাগিয়ে দিল। তিনি সজাগ হয়ে একটু থামলেন। এ সময় তিনি আবার দরজায় টোকার শব্দ শুনতে পেলেন। দরজায় টোকা দেয়ারও একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গি ঠিক করে দেয়া ছিল গোয়েন্দাদের জন্য। তিনি সেই সাংকেতিক টোকাই শুনতে পেলেন।
বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি। সাবধানতার জন্য একটি লম্বা খঞ্জর হাতে নিলেন। তারপর দরজা ফাঁক করে বললেন, 'কে?'
'আমি ভিক্টর। আগে ভেতরে চলুন, জরুরী কথা আছে।'
'রক্তের গন্ধ আসছে কোত্থেকে?' ইমাম সাহেব অন্ধকারেই রক্তের গন্ধ পেয়ে প্রশ্ন করে বসলেন।
'জ্বি, আমার শরীর থেকেই!' ভিক্টর উত্তর দিল।
ইমাম সাহেব আর কোন প্রশ্ন না করে তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখতে পেলেন, ভিক্টরের কাপড়ে রক্তের লাল দাগ। এখনও তা টাটকা ও ভেজা।

ভিক্টরের পরিচয় ইমাম সাহেবের জানা ছিল। সে কোথায় এবং কি দায়িত্বে আছে, তাও জানতেন তিনি। যদিও ভিক্টরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না তিনি, তবে ভিক্টর নামের একজন অপারেটর সম্রাট রিমাণ্ডের রাজপরিবারে খাদ্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছে এ কথা এখানকার দায়িত্বে এসেই জানতে পেরেছিলেন তিনি। নিয়ম মত তিনি তার কাজের রিপোর্টও পাচ্ছিলেন। সে যে খৃস্টান তাও জানতেন তিনি। এ ধরনের অপারেটরদের সামনে আনা বিপদজনক বিধায় তিনি কোন দিনই তাকে এখানে ডাকেননি, পরিচিত হতে চাননি। কিন্তু আজ যেহেতু সে নিজেই ছুটে এসেছে তখন বুঝতে হবে, বড় রকমের কোন সমস্যা হয়ে গেছে। তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তার সাথে কিছু সাংকেতিক কথা বিনিময় করলেন। এতে এই লোকই যে ভিক্টর সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন তিনি। এটাই গোয়েন্দাদের পরস্পরকে চেনার সহজ পদ্ধতি।

'তুমি এলে যে! চেঙ্গিস কোথায়? সে আসেনি কেন?' ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

'সে আর কোনদিন আসতে পারবে না।' ভিক্টর বললো।

'কেন?' ইমাম সাহেব ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি ধরা পড়ে গেছে?'

'তার পাপ তাকে গ্রেফতার করেছে।' ভিক্টর উত্তর দিল, 'আর আমার খঞ্জর তার পাপের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। আমার কাঁধ ও বাহু থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। আমার রক্ত পড়া বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন আপনি?'

'দাঁড়াও, আমি এখনি নতুন করে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি। তুমি ভয় পেয়ো না।'
ইমাম সাহেব জলদি ঔষুধ বের করলেন। পানি এনে তার আহত স্থান পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'কি ঘটেছে বলো তো!'
'বলছি। পেরেশান হওয়ার মত এখন আর কিছু নেই। যা ঘটার তা ঘটেই গেছে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করুন, চেঙ্গিস জীবিত নেই। সে বেঁচে থাকলে আমাদের কেউ কারাগারের নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারতাম না।'
ইমাম সাহেব তার জখম পরিষ্কার করে সেখানে ঔষধ ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। ভিক্টর ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ইমাম সাহেবকে খুলে বলতে লাগলো। সে বলল, 'যখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এই মেয়ে চরম ধোঁকা ও প্রতারণা দিয়ে চেঙ্গিসকে মহা বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি তাকে বাঁধা দিলাম। আমি সেই বুড়ো জেনারেলের খোঁজ নিলাম, যার আশ্রয়ে মেয়েটি আছে বলে জানিয়েছিল চেঙ্গিসকে। কিন্তু এই নামে তাদের কোন জেনারেলই নেই। মেয়েটি কোথায় থাকে এ খোঁজ নিতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। মেয়েটি ক্রুসেড বাহিনীর গোয়েন্দাদের কোয়ার্টারে থাকে।
গত কয়েকদিন ধরেই প্রতি রাতে সে চেঙ্গিসের পথ আগলে দাঁড়াচ্ছিল। এতে করে চেঙ্গিস আর আপনার কাছে পৌঁছতে পারছিল না। যে সব গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনার কাছে পৌঁছানো

জরুরী ভেবে তাকে আপনার কাছে পাঠাতাম, সেগুলো তার পকেটেই পড়ে থাকতো, আপনার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতো না। এটা যে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক, এ কথাটুকু বুঝার ক্ষমতাও তার লোপ পেয়েছিল।

মেয়েটা তার কাছে আসতো ধোঁকা দিয়ে তার মুখোশ খুলে দিতে। সে প্রতি মুহূর্তে চেঙ্গিসের ওপর দৃষ্টি রাখতো। নইলে সে যখনি বাগানে প্রবেশ করতো, মেয়েটি কোত্থেকে তার কাছে ছুটে আসতো? আমি এসব বলে যখনই চেঙ্গিসকে সাবধান করতে চেষ্টা করেছি, তখনই সে আমার উপর রাগে ফেটে পড়েছে।

আপনি শুনলে অবাক হবেন, সে মদ পান করতে শুরু করেছিল। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তাকে মদের সাথে হাশিশও পান করানো হয়েছিল। নইলে চেঙ্গিসের মত দৃঢ়চেতা লোক প্রতারণার শিকার হতে পারে না। আগেও অনেক সুন্দরী মেয়ে তাকে ভালবাসার জালে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। কিন্তু সে ওদের কোন পাত্তাই দেয়নি। ভালবাসার প্রস্তাব শুনলেই সে ওসব হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। এই মেয়েটা তাকে ঘায়েল করেছিল একই সঙ্গে তার রূপ, যৌবন, মদ আর হাশিশ প্রয়োগ করে। ফলে সে শারিরীক ভাবে না হলেও মানসিক ভাবে মেয়েটির ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল।

চেঙ্গিস যখন আমাকে বললো, সে গোয়েন্দা এ কথা মেয়েটির কাছে ফাঁস করে দিয়েছে, তখনই আমার প্রাণ কেঁপে উঠেছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, চেঙ্গিস যে অপরাধ করছে

তাতে সে একা মরবে না, আমাদের সবাইকে সে ডুবিয়ে মারবে। এর শাস্তি স্বরূপ এমন বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, যাতে মিশরের স্বাধীনতারও মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে।

আমি তাকে এসবই বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি তার মাথা এমন ভাবে খেয়ে ফেলেছিল যে, তার দায়িত্ব এবং ঈমানের দাবীর চাইতেও সে মেয়েটির কথাকে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল।

আমি তখন মনে মনে সংকল্প করলাম, এ বিপদ এড়াতে হলে একটাই পথ খোলা আছে, আর তা হলো, মেয়েটাকে হত্যা করা। এতেও যদি চেঙ্গিসের হুশ না হয়, তবে তাকেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। দেশ ও জাতির চাইতে কোন একক মানুষের মূল্য অধিক হতে পারে না। দেশের জন্য, জাতির জন্য, ধর্মের জন্য ব্যক্তির জীবন দান, নতুন কোন বিষয় নয়। যুগে যুগে এমনি নজরানা পেশ করার ফলেই সভ্যতা টিকে আছে। আর গোয়েন্দাদের ব্যাপারটি তো আরো নাজুক। এ জন্য সর্ব মহলের স্বীকৃত নীতিমালা হচ্ছে, দলে কেউ গাদ্দারী করলে বা তার দ্বারা গোপন তথ্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দাও।

তবুও আমি তাকে হত্যা করতে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছি। কিন্তু সে যখন আমাকে হত্যা করতে পাগল পারা হয়ে উঠলো.......'

'এটাও তো হতে পারে, তুমি তাকে ভুল ধারণায় খুন করে ফেলেছো।' ইমাম সাহেব বললেন, 'এমনও তো হতে পারে,

মেয়েটি মুসলমানই ছিল, সে সরল মনেই আমাদের জন্য কাজ করছিল এবং আরো করার ইচ্ছা ছিল!'

'হ্যাঁ! তা হতে পারতো।' ভিক্টর বললো, 'কিন্তু আমি যখন প্রমাণ পেলাম, তখন তো আর অনুমানের প্রশ্ন থাকে না। আমি নিজেই মেয়েটিকে তাদের ক্যাম্পে দেখেছি। এক জেনারেলের আশ্রিতা বলে সে যে কথা রটিয়েছে, সে কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই মেয়েটি সেখানেই থাকতো, যেখানে হরমনের গুপ্তচর বাহিনীর মেয়েরা থাকে। আজও সে ওই ক্যাম্প থেকেই রাতে বেরিয়ে এসেছিল এবং চেঙ্গিসকে অনুসরণ করে বাগানে ঢুকে তার সাথে অভিসারে মেতে উঠেছিল।

তারা যেখানে বসে গল্প করছিল তার থেকে কয়েকগজ দূরেই একটি ঝোপের আড়ালে বসে আমি তাদের সমস্ত আলাপ শুনেছি। মেয়েটি যেভাবে চেঙ্গিসের কাছ থেকে গোপন তথ্য বের করে নিচ্ছিল তা শুনলে যে কেউ বুঝতে পারতো, এই মেয়ে সত্যি ক্রুসেড বাহিনীর পাঠানো গোয়েন্দা। সে জানতে চাচ্ছিল, ত্রিপলীতে আমাদের কতজন গোয়েন্দা আছে। এখানে আমাদের কোন কমাণ্ডো বাহিনী আছে কিনা। এ তথ্য বের করার জন্য সে চেঙ্গিসকে একটি কাল্পনিক গল্প শোনাল। বলল, ক্রুসেড বাহিনীর বেশুমার রসদ ও আসবাবপত্র এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা আছে। সেখানে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, পেট্রোল ও বিস্ফোরক দ্রব্য আছে। এসব ধ্বংস করার জন্য কমাণ্ডো বাহিনী দরকার।

আমি এই শহরেরেই একজন সতর্ক গোয়েন্দা। আমি ভাল করেই জানি, যেখানে রসদ মওজুদ আছে বলে জানিয়েছে মেয়েটি, সেখানে এর কিছুই নেই। ইচ্ছে করলে আপনি নিজেই কাল সেখানে গিয়ে একবার দেখে আসতে পারেন।
চেঙ্গিস তার কাছে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের সমস্ত তথ্য দিয়ে দিল। সে আমার নাম নিয়ে এটাও বলল, খৃস্টান হলেও আমি মুসলিম বাহিনীর পক্ষে কাজ করছি। আপনি জানেন আমি এমন জায়গায় বসে আছি, যেখানে সকল সংবাদ ও গোপন তথ্য সহজেই জেনে নেয়া যায়। মেয়েটি যখন আমার নাম শুনলো, সে এতই আশ্চর্য হলো যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই বলতে পারল না।
সব তথ্য নেয়ার পর মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো এবং চেঙ্গিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই ক্যাম্পের দিকেই রওনা দিল।
আমি ভেবে দেখলাম, মেয়েটি আমাদের সমস্ত গোপন তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ তথ্য সোজা চলে যাবে হরমন সাহেবের কাছে। আর তার পরিণাম ফল যে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন।
আমি তৎক্ষণাৎ উঠে মেয়েটাকে ধরে ফেললাম ও আমার খঞ্জর তার বুকে বসিয়ে দিলাম। চেঙ্গিস আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাকে অনেক বুঝালাম, সত্য ঘটনা বললাম, কিন্তু মদের নেশা তাকে পশু বানিয়ে দিয়েছিল। আমি তার খঞ্জরের আঘাতে আহত হলাম, তবুও তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তার চিন্তা করবার ও বুঝবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল

আমি ভেবে দেখলাম, যদি সে জীবিত থাকে তবে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। তাতেও আমার কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু সে বেঁচে থাকলে আমাদের দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। শেষে বাধ্য হয়ে তাকেও দুনিয়া থেকে বিদায় করলাম।'

'তুমি ভালই করেছো!' ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি তোমার সিদ্ধান্তকে মেনে নিলাম। তুমি এখন ত্রিপলী থেকে বের হয়ে যাও। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'না!' ভিক্টর বললো, 'ভোর বেলা লোকেরা উঠে চেঙ্গিস ও মেয়েটির লাশ দেখতে পাবে। মেয়েটিকে হরমন সাহেবই এ কাজে নিযুক্ত করেছেন। অতএব তার এ কথা বুঝতে কোনই অসুবিধা হবে না যে, এই দু'জনকে মুসলমান গোয়েন্দারাই হত্যা করেছে। তখন খুনীকে ধরার জন্য মুসলমানদের ওপর কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে এ ক্ষমতা আগেই দেয়া হয়েছে যে, এখানে কোন লোকের উপর তার সন্দেহ হলে তিনি তাকে কারাগারে নিতে পারবেন, ইচ্ছে করলে তাকে হত্যাও করতে পারবেন।

ত্রিপলীর প্রতিটি মুসলিম বাড়ীতেই এখন গোয়েন্দা লাগানো আছে। তারা মুসলমানদের উপরে জুলুম অত্যাচার চালানোর জন্য কোন একটু সূত্র খুঁজছে। এই খুন তাদের হাতে সেই সূত্র তুলে দেবে। এটা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না।'

ভিক্টর বললো, 'আমি আমার ডিউটিতে ফিরে যাচ্ছি। এই হত্যাকাণ্ড আমিই করেছি, এর দায়িত্বও আমিই বহন করবো।

কারণ হিসাবে বলবো, চেঙ্গিস আমার প্রিয়তমাকে বিপথগামী করেছিলো।'

'আমি এত বড় কোরবানী তোমার কাছ থেকে নিতে পারি না।' ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি তোমার সাথে একজন লোক দিচ্ছি, সে তোমাকে কায়রো পৌছে দেবে।'

'আমি আমার জীবনের কোরবানীই তো দিতে চাই।' ভিক্টর বললো, 'আজ আমার জীবনের সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে, যখন আমাদের শহরে দুই খৃস্টান সামরিক অফিসার আমার বোনের উপর নজর দিয়েছিল। তারা তাদের সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিল আমার বোনকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য। কোন খৃস্টানই আমার বোনকে তাদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে রাজি হয়নি। কিন্তু সেদিন মাত্র তিনজন মুসলিম নওজোয়ান তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। লড়াই করতে করতে এক যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং বাকী দুই যুবক আহত হয়। কিন্তু তারা হার মানেনি, তারা আমার বোনকে উদ্ধার করতে পেরেছিল।

এই ঘটনাই আমাকে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। এক ভাই হয়ে আমি যা পারিনি, এক মুসলিম যুবক নিজের জীবন দিয়ে সেই অসাধ্য সাধন করেছিল। আমি এর শোকর আদায় করার সুযোগ খুঁজছিলাম। তাই যখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাকে গুপ্তচরবৃত্তি করার আহ্বান জানানো হলো, আমি তাতে রাজি হয়ে যাই। আমি আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দিয়েছিলাম সেই শহীদ

যুবকের বদলা দিতে। আমি আপনার কাছে সেই উপকারের বদলা দেয়ার একটু সুযোগ চাই। আমার মত একজন মানুষের কোরবানী যদি একটি জাতিকে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়, তবে এটা কি এক বিশাল পাওনা নয় আমার জন্য? তাহলে আপনি কেন আমাকে এই মহত্তর বদলা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন? আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে ত্রিপলীর মুসলমানদের জীবন ও সম্মান রক্ষা করার সামান্য সুযোগ চাই আপনার কাছে।'

সে ইমাম সাহেবকে আরো বললো, 'ক্রুসেড বাহিনী তাদের সৈন্যদেরকে একত্রিত করা শুরু করেছে। তাদের সমরাভিযান শুরু হবে হলবের দিক থেকে। তারা আগে হলব ও হারান অধিকার করার প্ল্যান নিয়েছে। এখনও জানা যায়নি, কবে তারা অভিযান শুরু করবে। আর এটাও জানা যায়নি, তাদের সকল সৈন্য কি এক দিনেই আক্রমণ চালাবে, নাকি বিভিন্ন দিকে ভাগ হয়ে যাবে, কিংবা একই সাথে সব সেক্টরেই যুদ্ধ চালাবে। সুলতান আইয়ুবীর কাছে এই সংবাদ অতি দ্রুত পৌছানো দরকার, তিনি যেন মিশরেই বসে না থাকেন।'

ভিক্টর যা কিছু জানতো সব কিছুই ইমাম সাহেবকে জানিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। ইমাম সাহেবের আপত্তি সত্ত্বেও সে বললো, 'আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে বা অন্য কাউকে এ ঘটনার জন্য কোন প্রশ্নই করবে না খৃস্টানরা।'

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো ভিক্টর। তার শরীর থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইমাম সাহেব তার আহত স্থানে ভাল মত পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন। সে যার কাছে যাচ্ছিল, সে যদি জানতে চায়, তোমার পট্টি বেঁধে দিল কে, এই ভয়ে সে তার পট্টি খুলে ফেললো। ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতেই তার ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্ত পড়া শুরু হলো।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে চেঙ্গিস ও মেয়েটির লাশ যেখানে পড়েছিল প্রথমে সে ওখানে গেল। রাতের শেষ প্রহর। মাথার ওপর থেকে ভাঙা চাঁদ গড়িয়ে পড়ছিল পশ্চিম দিগন্তে।

ভিক্টরের চোখের সামনে এতীমের মত পড়েছিল মদের সুরাহী ও দু'টি পিয়ালা। চাঁদের আলোয় সে ভাল করে তাকালো মেয়েটির দিকে। কি অপরূপ মায়াময় মিষ্টি মুখ! মৃত্যুও তার সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারেনি। একগুচ্ছ খোলা রেশমী কোমল চুল তার বুকের উপর ছড়িয়ে ছিল। লালিত্যময় হাত দু'টো দিয়ে তখনো সে আঁকড়ে ধরে ছিল বুকের সে ক্ষতস্থান, যেখানটা ভিক্টর তার খঞ্জর দিয়ে ফুটো করে দিয়েছিল।

ভিক্টর তাকালো মদের সুরাহীর দিকে। মেয়েটির পাশেই কাত হয়ে পড়েছিল সেই সুরাহী। সেদিকে তাকিয়ে ভিক্টর বিড় বিড় করে বললো, 'মানুষ তার নিজের ধ্বংসের উপকরণ কেমন অপরূপ করে তৈরি করেছে, দেখো!'

মেয়েটির কাছ থেকে সরে সে গেল চেঙ্গিসের লাশের পাশে।

তার দিকে দীর্ঘক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকলো। তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো অশান্ত অশ্রু রাশি। সে তার কাছে বসে পড়ল। হাত দিল চেঙ্গিসের শরীরে। বরফের মাত ঠাণ্ডা শরীর।

একটু আগেও এই শরীরে জীবনের উত্তাপ ছিল। সে নিজ হাতে সেই উত্তাপ কেড়ে নিয়েছে। অনেক দিন তারা একত্রে ছিল। বহু সুখ-দুঃখ তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এক জনের কষ্ট মুছিয়ে দিয়েছে অন্য জন। এক জনের শোকে অন্য জন শান্তনা দিয়েছে। সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিজ হাতে খুন করেছে ভিক্টর! নিয়তির কি নির্মম পরিহাস!

তাকে খুন করে ভিক্টর অনুতপ্ত নয়, বরং তৃপ্তি অনুভব করছে! ওকে খুন না করলে খুন হয়ে যেতো একটি জাতি! চরম সর্বনাশের হাত থেকে সেই জাতিকে সে রক্ষা করেছে, পৃথিবীতে যারা মানবতার নিশান উড়াতে চায়।

চেঙ্গিসের হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগ ভরা কণ্ঠে সে বললো, 'তুমি ভাল করেই জানতে, মদের নেশা বাদশাহকেও সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়। তুমি এই দুর্বলতাকে নিজের মধ্যে কেন ঠাঁই দিয়েছিলে বন্ধু!

তুমি এও জানতে, ছলনাময়ী নারীর খপ্পড়ে পড়ে কত রাজ্য আর রাজা ধ্বংস গেছে। কেন তুমি তেমনি এক নারীর খপ্পড়ে পড়ে গেলে বন্ধু!

তোমার ধর্ম কত মহান! নারীর সাথে মেলামেশার সে এমন সুন্দর বিধান দিয়েছে, যা মানলে এই মাটির পৃথিবীতেই

বেহেশতের সুখ অনুভব করা যায়! কেন সেই পথে না গিয়ে গোপন মেলামেশার পথ বেছে নিলে বন্ধু!

তুমি যদি এ পথে পা না বাড়াতে তাহলে আমাকে আর জল্লাদ হতে হতো না। তোমার ধর্মের যে সৌন্দর্য দেখে আমি অভিভুত হয়ে তার হেফাজতের জন্য সর্বস্ব পণ করে বসে আছি, তুমি সেই ধর্মের অনুসারী হয়েও কেন তার সৌন্দর্য দেখতে পেলে না বন্ধু!'

চেঙ্গিসের লাশ আঁকড়ে ধরে সেই জনশূন্য বাগানে একাকী বসে বিলাপ করছিল ভিক্টর। তার সেই বিলাপের শেষ কয়টি কথা ছিল এমন: 'আমিও আসছি প্রিয় বন্ধু! জল্লাদ শীঘ্রই আমাকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবে। আমি তোমার প্রভুর কাছে কড়জোড়ে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, আমার এই বন্ধু তোমার দ্বীনের জন্যই সর্বস্ব পণ করে এই বাহিনীতে শামিল হয়েছিল। সারা জীবন, বিশেষ করে যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময় সে তোমার পথে ব্যয় করেছে। তার এ ক্ষণিক ক্রটি তুমি ক্ষমা করে দিও প্রভু! আমরা একই গন্তব্যের যাত্রী।

এতদিন তোমার দ্বীনের জন্য কাজ করলেও দ্বীনের হুকুম আহকাম কিছুই মানতে পারিনি। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে তোমার দ্বীন কবুলও করিনি। তবু তুমি জানো আমার অন্তরের খবর। যেদিন তিন মুজাহিদ আমার বোনকে খৃস্টানের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল, সেদিন থেকেই আমিও মনে মনে তোমার দ্বীনকে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। আল্লাহ, আমাকে তুমি তোমার দ্বীনের পথের এক সামান্য গোলাম হিসাবে

কবুল করে নাও।'

সে লাশ জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল আর বলছিল, 'আমিও আসছি বন্ধু! একটু অপেক্ষা করো। এই তো আমি আসছি বলে!'

সে সেখান থেকে উঠলো ও দ্রুত পদক্ষেপে সেই মহলের দিকে চললো, যেখানে শহরের পুলিশ প্রধান থাকেন।

তার শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। সে খাপ থেকে খঞ্জর বের করলো। খঞ্জরের জমাট রক্ত কালচে হয়ে গিয়েছিল। সে তার দেহের তাজা রক্ত দিয়ে খঞ্জরটি ভিজিয়ে নিল এবং খঞ্জরটি হাতেই রাখলো। অতিরিক্ত রক্ত বের হওয়ায় সে খুব দুর্বল বোধ করছিল।

অতি কষ্টে সে কোন মতে পুলিশ প্রধানের ফটক পর্যন্ত পৌঁছল। এগিয়ে গিয়ে আঘাত করলো ফটকে। এক সেন্ট্রি এসে ফটক খুলে দিল।

ভিক্টর অফিসারের নাম নিয়ে বললো, 'জলদি তাকে জাগিয়ে দাও। আর বলো, এক খুনী আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

এ কথা শুনে সেন্ট্রিবক্স থেকে আরেক সিপাই ছুটলো ভেতরে। কয়েক মিনিট কেটে গেল চুপচাপ। এরপরই ভেতর থেকে শোনা গেল গালি-গালাজের আওয়াজ। পুলিশ প্রধান গালি দিতে দিতে বেরিয়ে এলো। দরজার কাছে এসে গর্জে উঠে বললো, 'ও তুমি? কার সাথে এমন লড়াই শুরু হয়েছিল?' পুলিশ প্রধান তাকে চিনতে পারলো।

'আমি দু'টি মানুষের খুনের স্বীকারোক্তি করতে এসেছি।'

ভিক্টর বললো, 'আমাকে গ্রেফতার করুন।'
পুলিশ প্রধান তার মুখে জোরে এক থাপ্পড় মেরে বললো, 'তুমি আর খুন করার সময় পাওনি? দিনের বেলায় কি করেছিলে? আমি তোমার বাবার চাকর নাকি যে, এখন তোমাকে গ্রেফতার করতে যাবো? কি আমার নবাবজাদা! আমাকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে গ্রেফতার করুন!'
ক্ষিপ্ত পুলিশ প্রধান সেন্ট্রিকে বললো, 'একে নিয়ে যা তো, কারাগারে বন্দী করে দে।'
সেন্ট্রি ভিক্টরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার হাত ধরলো, পুলিশ প্রধান আবার গর্জে উঠলো, 'ওরে, দাঁড়া, বোকা কোথাকার! তুই কি একটুও চিন্তা করিসনি, এই খুনী তোকেও খুন করে ফেলতে পারে? একে ভেতরে নিয়ে আয়। সে কি কেস করেছে?'
'আমি এক পুরুষ ও এক নারীকে হত্যা করেছি স্যার!' ভিক্টর জোরেই বললো।
'খুন করেছো?' পুলিশ প্রধান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি তুমি খুন করেছো? যদি মুসলমানকে খুন করে থাকো, তবে যাও, ক্ষত স্থানে মলম ব্যাণ্ডেজ করো। বাকীটা আমি দেখবো। আর যদি কোন খৃস্টানকে খুন করে থাকো, তবে তার সাজা অবশ্যই তোমাকে পেতে হবে। চলো, ভেতরে গিয়ে কথা বলি।'
'আপনি তো আমার সাথে এক সুন্দর যুবককে দেখেছেন!

রাশেদ চেঙ্গিস।' ভিক্টর ভেতরে গিয়ে বললো, 'আমার এক সুন্দরী যুবতীর সাথে ভালবাসা ছিল। সে ছিল আমার বন্ধু। আমাদের প্রেমের বিষয়টা সে জানতো এবং মেয়েটিকেও চিনতো। সেই গাদ্দার সব জেনেশুনেও আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে মেয়েটিকে ফুসলিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল এবং নিজে তার সাথে প্রেম করা শুরু করল।

এই নিয়ে তার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। সে আমাকে চরম ভাবে অপমান করে। আমি মেয়েটির অন্ধ প্রেমিক ছিলাম। কিছুতেই তাকে হারাতে রাজি ছিলাম না আমি। মেয়েটি চেঙ্গিসের সাথে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করলো। কিন্তু গত রাতে অভিসাররত অবস্থায় আমি তাদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলি।

তখন চেঙ্গিস আমাকে খুন করার জন্য ছুটে আসে। মেয়েটি ছুটে এসে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। সে আমাকে আঘাত করতে চাইলে সে আঘাত আমার পরিবর্তে মেয়েটির বুকে বিদ্ধ হয়। খুন হয়ে যায় আমার প্রেমিকা। আমার মাথায়ও তখন খুন চেপে যায়। আমি চেঙ্গিসের ওপর খঞ্জর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সেও আমাকে খুন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

সে আমার কয়েক জায়গায় জখম করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমিও ছেড়ে দেয়ার পাত্র ছিলাম না। আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং শেষ পর্যন্ত আমিই সফল হলাম।

অবশেষে তারা দু'জনেই মারা যায়। আমার যখন হুশ হলো, তখন ভাবলাম, হায়, আমি এ কি করলাম! সেই থেকে আমার মন অস্থির হয়ে উঠল। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, আমার মুক্তির যদি কেউ ব্যাবস্থা করতে পারে, সে কেবল আপনি। তাই আমি সেখান থেকে সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।'

পুলিশ প্রধান তাকে বললো, 'মেয়ে মানুষের জন্য খুন-খারাবী করা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ঠিক আছে, তুমি বাসায় চলে যাও, আমি দেখছি কি করা যায়।'

পুলিশ প্রধান তাকে গ্রেফতার না করে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। কারণ ভিক্টর ছিল সম্রাট রিমাণ্ডের রাজ কর্মচারী। পুলিশ প্রধানের বিবেচনায় এমন দু'একটা খুন সে করতেই পারে।

কিন্তু সকাল বেলা সকলেই দু'জনের লাশ দেখে তো হতবাক। হরমন এবং তার সহকারীর কাছেও গিয়ে পৌঁছল এ খবর। তারা যখন এ খবর জানতে পারলো, তখন তারা দু'জনেই রেগে আগুন হয়ে গেল।

মেয়েটি তাদের অত্যন্ত করিৎকর্মা গোয়েন্দা ছিল আর চেঙ্গিস ছিল তার শিকার। চেঙ্গিসকে অবলম্বন করেই তারা ত্রিপলীতে অবস্থানরত মুসলিম গোয়েন্দাদের পুরো দলটাকে ধরার জাল পেতেছিল। দলটা এরই মধ্যে জালের ভেতর মাথা ঢুকিয়েও দিয়েছিল, এখন শুধু জাল গুটিয়ে আনা বাকী।

এই অবস্থায় কেবল শিকার নয়, জাল এবং জেলে শুদ্ধ সর্বকিছু গায়েব করে দিল যে আহাম্মক, আক্রোশটা তার ওপর

গিয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। তার কারণে মুসলিম গোয়েন্দাদের ধরায় যে সূত্রটি তাদের হাতে এসেছিল, তা গায়েব হয়ে গেল। সেই সাথে গায়েব হয়ে গেল তাদের চৌকস গুপ্তচর কন্যা। সব মিলে যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, ভিক্টরের মত একশ গর্দভকে খুন করলেও তার বদলা আদায় হবার নয়।

ক্রুদ্ধ আক্রোশে এ সবই ভাবছিল হরমন। সঙ্গে সঙ্গে তার সহকারীকে হুকুম দিল, 'ওই গর্দভটাকে ধরে এনে আচ্ছা মত পিটুনি লাগাও।'

ভিক্টরের ক্ষত স্থান থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। কেউ তাকে ঔষুধ দেয়ার বা সেই ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ করার প্রয়োজনও বোধ করলো না। সেই অবস্থায় তাকে ধরে আনা হল।

হরমনের মত তার সহকারীও প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ছিল ভিক্টরের ওপর। তাকে হাতের কাছে পেয়েই সে সমানে পিটাতে শুরু করলো। ভিক্টর শেষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তার পরে আর তার জ্ঞান ফেরেনি। পরের দিন অজ্ঞান অবস্থায়ই তাকে জল্লাদের সামনে উপস্থিত করা হলো। জল্লাদ তাকে এক চৌকির ওপর শুইয়ে ধারালো অস্ত্রের এক আঘাতেই দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিল।

তার দেহ ও মাথা পৃথক দুই গর্তে যখন পুতে ফেলা হচ্ছিল, সে সময় ইমামের প্রেরিত এক গোয়েন্দা ত্রিপলী থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। উটের উপর সওয়ার হয়ে সে যাচ্ছিল কায়রোর দিকে। কায়রো সেখান থেকে অনেক দূর। এমন দীর্ঘ সফরের ধকল কেবলমাত্র উটই সহ্য করতে পারে। এই

দুর্গম পথের কষ্টকর সফরের মাঝেও সেই পথিক এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করছিল। কারণ এমন মূল্যবান তথ্য নিয়ে এই প্রথম সে যাচ্ছিল মুসলমানদের আশা ভরসার কেন্দ্র সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে।

৫৭৩ হিজরী মুতাবেক ১১৭৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকের ঘটনা। কায়রোর প্যারেড গ্রাউণ্ডে অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। নতুন ভর্তি সৈন্যরা ট্রেনিং শেষে ওখানে কুচকাওয়াজ করছিল। কখনো সেখানে চলছিল ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা। কখনো নেজাবাজি, তলোয়ার যুদ্ধ, মল্ল যুদ্ধ, তীরের নিশানা।

পদাতিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের পর মাঠে এলো উষ্ট্রারোহী বাহিনী। তাদের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল ঘোড় সওয়ার বাহিনী।

কায়রো শহরের বাইরে এক পাহাড়ী এলাকা। কেউ দেখলে ভাববে এখানে দুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলছে। আসলে সেখানে আইয়ুবীর নতুন সৈন্যদের মহড়া চলছিল।

সৈন্যরা সেখানে পেট্রোল বোঝাই হাড়ি নিক্ষেপ করে তাতে অগ্নিবান নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশ হাত এলাকা জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। অশ্বারোহীরা সেই আগুনের মধ্য দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল একদিক থেকে অন্য দিকে।

এ রকম যুদ্ধ মহড়া শুরু হলো মরু অঞ্চলেও। কোন সৈন্যেরই সেখানে সঙ্গে পানি রাখার অনুমতি ছিল না।

এ সবই ছিল কঠিন প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়। নতুন রিক্রুট সৈন্যরা পরম উৎসাহে তাতে অংশ নিচ্ছিল। ভর্তি কার্যক্রমও তখন চলছিল সমান তালে। সামরিক বাহিনীর সমস্ত সেনাপতি, কমাণ্ডার ও অফিসাররা ট্রেনিং নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

সুলতান আইয়ুবী সেনাবাহিনীকে এ কাজে লাগিয়ে দিয়ে দেশের প্রশাসনিক কাজের দিকে মনযোগ দিলেন। দিনে ব্যস্ত থাকতেন প্রশাসনিক কাজে, রাতে সেনাপতি এবং অফিসারদের নির্দেশ দিতেই তার রাত শেষ হয়ে যেতো।

এক রাতে তিনি অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। তিনি উপস্থিত অফিসারদের বললেন, 'যদি ক্রুসেড বাহিনী এ মুহূর্তে সেনা অভিযান না চালায় তবে তোমরা হয়তো ভাবতে পারো, তারা যুদ্ধ করতে অপারগ। কিন্তু এটা বিশ্বাস করা যায় না। তারা অবশ্যই আসবে, সিরিয়ার দিক দিয়ে না হোক, অন্য কোন দিক দিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা আক্রমণ চালাবেই এবং তা অতি তাড়াতাড়ি।'

পরদিন তিনি সৈন্যদের মহড়া পরিদর্শনে গেলেন। তিনি এক উপত্যকায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের মহড়া দেখছিলেন। এক সেনাপতি সুলতানকে বললেন, 'এ পর্যন্ত শত্রু কবলিত অঞ্চল থেকে কোন না কোন ব্যক্তির আসা প্রয়োজন ছিল।'

সুলতান আইয়ুবী তার দিকে ফিরলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। আমিও এ কথাই ভাবছিলাম। ক্রুসেড বাহিনী অবশ্যই আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। তবে তারা কোন দিক থেকে আসবে সে সংবাদ শুধু গোয়েন্দারাই বলতে

পারবে। তারাই বলতে পারবে দুশমন কোথায় প্রথম আক্রমণ করবে এবং তাদের সৈন্য সংখ্যা কত। শত্রু অঞ্চল থেকে আমাদের গোয়েন্দারা যতক্ষণ এ খবর না দিচ্ছে, ততক্ষণ আমরা অন্ধকারেই থাকবো।'

তিনি কথা বলছিলেন আর উপত্যকায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন দূর পাহাড়ের দৃশ্যাবলী। তখন তার নজরে পড়লো, দূরে ধূলি উড়ছে। এই ধূলি এক কিংবা দু'টি অশ্বারোহীর ছুটে আসার আগাম খবর দিচ্ছিল। তিনি পাশের অফিসারকে বললেন, 'দেখো তো, ওদিক দিয়ে কেউ আসছে মনে হয়!'

সঙ্গী অফিসার সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'মোহতারাম সুলতান! মনে হয় আমাদের কোন সঙ্গীই আসছে।'

সুলতান আইয়ুবী অফিসারকে নিয়ে যেদিক থেকে ধূলি উড়ছিল সেদিকে কিছু দূর এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে ধূলি মেঘ আরো কাছে চলে এসেছে। সহসা ধূলি মেঘের মধ্যে দু'টি অশ্ব দেখা গেল।

অশ্বারোহীরা আরো কাছে এলে তিনি একজনকে চিনতে পারলেন। একটি অশ্বের উপর ছিলেন আলী বিন সুফিয়ান, অপর আরোহীকে তিনি চিনতে পারলেন না। সে ছিল ত্রিপলী থেকে ইমাম সাহেবের পাঠানো সেই গোয়েন্দা, যে ত্রিপলী থেকে রওনা দিয়েছিল উটের আরোহী হয়ে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বেশ কিছু দিন পর সে কায়রো এসে পৌঁছে। আলী বিন সুফিয়ান তার কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে

দেরী না করেই তাকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলেন। উদ্দেশ্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ রিপোর্ট সুলতান আইয়ুবীকে পৌঁছানো।

গোয়েন্দা সুলতান আইয়ুবীকে জানালো, 'ক্রুসেড বাহিনী ঝড়ের গতিতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের সৈন্য সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশী সৈন্য নিয়ে এসেছে সম্রাট রিনাল্ট। তিনি এই বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে চান।'

'এই সে রিনাল্ট, যাকে নূরুদ্দিন জঙ্গী গ্রেফতার করে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কারাগারে রেখেছিলেন।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তিনি তাকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে রিনাল্টের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। ক্ষমতা ও অর্থ লোভী আমীররা মরহুম জঙ্গীর নাবালক সন্তানকে গদীতে বসিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রিনাল্টকে নি:শর্ত মুক্তি দিয়ে দেয়। আজ সেই রিনাল্টই ইসলামকে মিটিয়ে দিতে আসছে। হ্যাঁ, পরবর্তী রিপোর্ট শোনও! তারই তো আক্রমণ করা উচিত, সে ছাড়া আর কে করবে?'

'ত্রিপলীর সম্রাট রিমাণ্ড এই যুদ্ধের মূল পরিকল্পনাকারী। অধিকাংশ সৈন্য ওখানেই সমবেত হচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের খৃস্টান সম্রাটরা ওখানে বসেই আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছেন। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন সম্রাট বিল্ডন। তার সৈন্য সংখ্যাও কম নয়। ক্রুসেড বাহিনী কবে নাগাদ আক্রমণ

চালাবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে আক্রমণ হবে হলব, হারান ও হিম্মতের দিক দিয়ে এই সংবাদ পাওয়া গেছে। যুদ্ধে জেতার জন্য তারা সিরিয়াকেও ব্যবহার করবে। সিরিয়া ব্যাপক আক্রমণে না গেলেও সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত ও পেরেশান করবে। যুদ্ধের চূড়ান্ত দিন তারিখ ঠিক না হলেও শীঘ্রই তারা যুদ্ধ যাত্রা করবে, এটা বুঝা যাচ্ছে।'

'আলী বিন সুফিয়ান!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'ত্রিপলী থেকে শেষ সংবাদ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকবো আমি। সুনির্দিষ্ট দিন তারিখের খবর অবশ্যই তুমি পাবে। ওই পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে চাই। আমি জানতে চাই, তারা কোন পথে কত সৈন্য নিয়ে যাত্রা করছে।'

'সে সংবাদের জন্য অপেক্ষা করার সময় আপনি পাবেন না সুলতান।' আলী বিন সুফিয়ান নয়, কথাটা বললো সেই গোয়েন্দা, যে ত্রিপলী থেকে এসেছিল। 'ক্রুসেড বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে আমাদের যে দু'জন গোয়েন্দা ছিল, তারা দু'জনেই মারা গেছে।'

রাশেদ চেঙ্গিস ও ভিক্টরের ঘটনা তুলে ধরে সে বললো, 'সম্রাট রিনাল্ট দাবী করেছেন, তার বাহিনীতে আড়াই'শ নাইট রয়েছে।'

সুলতান আইয়ুবীর চোখ রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'যুদ্ধে প্রথম পরাজয় ঘটে যখন কোন বাহিনী প্রতিপক্ষের শক্তি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিতে

না পারে। ইমাম সাহেব তোমাকে আর কিছু বলেছেন?'
'ইমাম সাহেব জানিয়েছেন, সেই দুই গোয়েন্দা মরার আগে বলে গেছে, ক্রুসেড যোদ্ধারা আপনার গেরিলা বাহিনীকে এবার আর অতর্কিত অন্ধকারে আক্রমণের সুযোগ দেবে না। তারা এমন কিছু ফন্দি এঁটেছে, যাতে কমাণ্ডো বাহিনী বেকায়দায় পড়ে যাবে।'
'আর! আর কোন খবর আছে?'
'আপনার দুর্বলতাটুকু জানা আছে ক্রুসেড বাহিনীর। তারা জানে, আপনার সৈন্য সংখ্যা কম। অভিজ্ঞ সেনানায়করা বিগত যুদ্ধগুলোতে হয় মারা গেছে, নয়তো পঙ্গু হয়েছে। তাছাড়া আপনার কাছে এখন যুদ্ধ উপকরণও সামান্যই আছে।' বললো সেই গোয়েন্দা, 'তাই তারা এবার বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে, যাতে আপনার বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে।'
গোয়েন্দার কাছ থেকে এই সংবাদ পাওয়ার পর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বেশী বাইরে বেরুতে দেখা যেত না। তিনি অধিকাংশ সময় তার নিজের অফিস কক্ষেই থাকতেন। কাগজের উপর সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিকল্পনা ও নকশা আঁকতেন। সেই নকশার উপর আক্রমণের ও পাল্টা আক্রমণের রেখা আঁকতেন।
কখনও তিনি সেনাপতিদের ডেকে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কখনও তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে যেতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, 'তোমরা ভাল মত চিন্তা-ভাবনা

করো। স্বাধীনভাবে সেই মতামত ব্যক্ত করো। উত্তম কোন চাল মাথায় এলে তা প্রকাশ করতে বিলম্ব করো না। এবারের লড়াই হবে বুদ্ধির। সৈন্য সংখ্যা দিয়ে এবার খৃস্টানদের মোকাবেলা করা যাবে না। জিততে হলে কৌশল ও বুদ্ধির জোরেই জিততে হবে।'

এই সেনাপতিদের মধ্যে একজন ছিলেন ঈশা আল হেকারী। তিনি যেমন যোগ্য সেনাপতি ছিলেন, তেমনি ছিলেন পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ। অনেক ঐতিহাসিক তাকে সুলতান আইয়ুবীর দক্ষিণ হস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

একদিন সুলতান আইয়ুবী হঠাৎ কোন ঘোষণা ছাড়াই সৈন্যদের যুদ্ধ যাত্রা করার হুকুম দিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর এক বিরাট অংশকে সুদানের সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। কারণ ওদিক থেকে আক্রমণের যে আশংকা ব্যক্ত করছিল গোয়েন্দা, তিনি তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারছিলেন। সিরিয়া বর্ডারে গোলমাল সৃষ্টি করলে তাদের মদদ জোগাবে ক্রুসেড বাহিনী। এই অবস্থায় ক্রুসেড বাহিনীর মোকাবেলার জন্য তিনি মিশরের সব সৈন্যকে সঙ্গে নিতে পারছিলেন না।

তিনি যখন যুদ্ধ যাত্রা করলেন তখন, ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার পদাতিক বাহিনী। এরা সবাই ছিল মামলুক বংশের। এরা সাহসী, বীর ও যোদ্ধা। এ ছাড়া আট হাজার ছিল অশ্বারোহী সৈন্য। এদের অধিকাংশই ছিল মিশরী ও সুদানী। ১১৬৯ সালে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে তাদের সেনা

বাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তাদেরকে এক উর্বর অঞ্চলে কৃষিকাজে নিয়োজিত করা হয়। এখন তারা মিশরের এমন অনুগত প্রজা, যাদের উপর ভরসা করা যায়। এই আট হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক বাহিনীর সবাই নতুন রিক্রুট করা সৈন্য।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর নিজস্ব সৈন্য বাহিনী তার ভাই তকিউদ্দিনের নেতৃত্বে হলবে রেখে এসেছিলেন। তিনি গোপন সূত্রে জানতে পারলেন, এখনও সিরিয়ার সেনা বাহিনী সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য কোন প্রস্তুতি নেয়নি।

তিনি তীব্রগতিতে হলব গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি জানতে পারলেন, ক্রুসেড বাহিনী হারান দূর্গ অবরোধ করে রেখেছে। সুলতান আইয়ুবী সেখানে দম না নিয়েই ছুটলেন হারান অভিমুখে। দূর্গ অবরোধকারী ক্রুসেড বাহিনীকে স্তম্ভিত করে তিনি সেই বাহিনীকে পাল্টা অবরোধ করে বসলেন।

সুলতান আইয়ুবীর এই অবরোধ ও আক্রমণ এমন আকস্মিক ছিল যে, ক্রুসেড বাহিনী ফিরে দাঁড়ানোর আগেই তিনি সেই বাহিনীকে তছনছ করে দিলেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ধাওয়া আর পাল্টা ধাওয়া চললো বিক্ষিপ্তভাবে। ক্রুসেড বাহিনী আর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেল না। আইয়ুবীর পাল্টা ধাওয়া খেয়ে ছিন্নভিন্ন ক্রুসেড বাহিনী পালাতে গেল। বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে ত্রিপলী থেকে ছুটে আসা ক্রুসেড বাহিনী পালাতে গিয়ে পড়ল মহা বেকায়দায়। এখানকার পথঘাট

তাদের অচেনা, জনগণ তাদের প্রতিপক্ষ। কে তাদের আশ্রয় দেবে, কে দেবে একটু লুকানোর জায়গা?

না, তারা লুকানোর কোন জায়গা পেল না। হারানের জনগণ গণধোলাই দিয়ে তাদের ধরে এনে সুলতানের বাহিনীর হাতে সোপর্দ করতে লাগল। দেখতে দেখতে ক্রুসেড বাহিনীর বহু সৈন্য ধরা পড়লো আইয়ুবীর বাহিনীর হাতে।

এই ফাঁকে বেরিয়ে এলো হারান দূর্গের সৈন্যরা। তারা শত্রু সৈন্য বন্দী করার খেলায় মেতে উঠল। বৃষ্টি হলে কৈ মাছ যেমন পানি থেকে উঠে এসে মাঠ জুড়ে ছুটতে থাকে তেমনি ছুটছিল ক্রুসেড বাহিনী। আর গ্রামের ছেলে-বুড়ো কৈ মাছ ধরার মতই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তাদের ধরে ধরে মুসলিম বাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছিল।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এই সৈন্য ধরা খেলায় অংশ নিলেন না। তিনি দুর্গের সৈন্যদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে নিজের বাহিনী নিয়ে ছুটলেন অভিযানে। ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে খৃস্টান অধিকৃত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লিডিয়া ও রমলা দখল করে নিলেন।

মিশরের নতুন রিক্রুট সৈন্যদের মনোবল এই বিজয়ে অনেক বেড়ে গেল। তারা ভাবলো, যুদ্ধে বিজয় লাভ করা তো তেমন কঠিন কিছু নয়! শুধু একটু সাহস ও মনোবলের দরকার। তাহলেই দুশমন ফৌজ ধরাশায়ী হয়ে যায়।

তাদের আরো মনে হলো, যেখানে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী থাকবেন, বিজয় সেখানে এসেই চুমু খাবে। তিনি যে

বলেছেন, 'অবশেষে সত্যের সেনানীরাই বিজয়ী হয়' এটাই খাঁটি কথা। আমরা লড়াই করি নামে মাত্র, মূল লড়াই তো করে আল্লাহর ফেরেশতারা। তাই বিজয় কেবল আমাদের ভাগ্যেই লেখা আছে।

এই চিন্তা নতুন সৈন্যদের ওপর দু'রকম প্রভাব ফেলল। একদল খুব বেপরোয়া হয়ে গেল। তারা ধরেই নিল, বিজয় যেহেতু আমাদের হাতে, অতএব নির্ভয়ে অস্ত্র চালাও। দুশমন শেষ পর্যন্ত আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আরেকদল এই ভাবনার কারণে অসাবধান হয়ে উঠলো। তাদের ইচ্ছা এ রকম, বিজয় তো আমাদের হবেই। অতএব ঝুঁকি এড়িয়ে গিয়ে ময়দানে একটু দাঁড়াতে পারলেই হয়। তারপর আল্লাহর সাহায্য চলে আসবে এবং আমরা বিজয় নিয়ে ময়দান থেকে আবার ঘরে ফিরে যাবো।

ক্রুসেড বাহিনী এই প্রথম নিজেদের পরিকল্পনা রেখে আইয়ুবীর স্টাইলে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল। তারা ইচ্ছে করেই অল্প সংখ্যক সৈন্য দিয়ে হারান দুর্গ অবরোধ করেছিল। তারা জেনে শুনেই ফ্রান্কিসের বাহিনীকে হারান দুর্গ অবরোধ করতে পাঠিয়েছিল। সম্রাট রিনাল্ট ও বিল্ডনের শক্তিশালী বাহিনী তখনও ছিল বেশ দূরে, রমলার কাছে এক পাহাড়ের আড়ালে। তারা জানতো সুলতান আইয়ুবী সহজেই হারানের খৃস্টান বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে। হারানে বিজয় লাভ করলে আইয়ুবী কিছুতেই সেখানে থেমে থাকবে না। সে এগিয়ে লিডিয়া ও রমলার দুর্গ দখল করতে ছুটে আসবে।

আর এই সুযোগটিই গ্রহণ করতে হবে আইয়ুবীকে জন্মের মত শিক্ষা দেয়ার জন্য।

সুলতান আইয়ুবীর কাছে ত্রিপলীর গোয়েন্দা ছাড়া আর কোন গোয়েন্দা আসার সুযোগ পায়নি। তার আগেই তিনি ঝড়ের বেগে অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফলে খৃস্টান বাহিনীর চূড়ান্ত অভিযানের খবর আইয়ুবীর কাছে পৌঁছাতেই পারেনি।

রমলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এক নদী। নদীতে তেমন পানি ছিল না। তাই নদীর পাড় ছিল বিস্তৃত। নদীর পাশে বড় বড় বৃক্ষের সারি। নদীর সুবিস্তৃত ঢালুতে লুকিয়ে ছিল খৃস্টানদের বিশাল বাহিনী।

সেনাপতি ঈশা আল হেকারী রমলা জয় করার পর তার সৈন্যদেরকে রমলার আশেপাশে ছড়িয়ে দিলেন। হঠাৎ নদীর ঢালু পাড় বেয়ে পিঁপড়ের সারির মত উঠে এলো ক্রুসেড বাহিনী। আইয়ুবী যেমন অতর্কিতে দুশমন বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু তছনছ করে দিতেন, তেমনি ওরা তুফান বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই বাহিনীর ওপর।

নদীর পাড়ে ক্রুসেড বাহিনী লুকিয়ে আছে এ কথা জানা ছিল না হেকারীর বাহিনীর। বিজয়ের পর তারা ঢিলেঢালা মেজাজে পাহাড়ের ঢালে, বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। কোত্থেকে এত ক্রুসেড সৈন্য ছুটে এল এ কথা বুঝার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল অনেক মুজাহিদ। ক্রুসেড বাহিনীর এই প্লাবনের সামনে দাঁড়ায় সে শক্তি ঈশা আল হেকারীর সৈন্যদের ছিল

না। ক্রুসেড বাহিনীর এ আকস্মিক হামলায় বহু সৈন্য অজ্ঞাতেই মারা পড়ল।

যারা নদী পাড় থেকে দূরে ছিল তারা তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু খৃস্টান বাহিনীর প্লাবনের মুখে খড়-কুটোর মতই ভেসে গেল তারা। যারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আর মোকাবেলা করার সুযোগ পেল না। ত্রিপলীর সেই গোয়েন্দার রিপোর্টই সত্য প্রমাণিত হলো, ক্রুসেড বাহিনী এবার এমন চাল চালবে, যা সুলতান আইয়ুবীর ধারনার বাইরে। আইয়ুবীর যুদ্ধের চাল বুঝে ফেলেছে খৃস্টান বাহিনী। পুরোনো চালে লড়ে আর জিততে পারবেন না আইয়ুবী।

ইবনে আসির লিখেছেন, 'ক্রুসেড বাহিনী নদী থেকে এমন স্রোতের মত পাড়ে প্লাবিত হতে লাগলো, যেন ঘোড়া ও জনতার স্রোত নদীর কুল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। সুলতান আইয়ুবীর সামান্য সৈন্য সেই স্রোতের মুখে পড়ে অজ্ঞাতেই মারা গেল।'

প্রসিদ্ধ খৃস্টান ঐতিহাসিক জেমস লিখেছেন, 'সম্রাট বিলডন সুলতান আইয়ুবীর আগেই তার বিশাল বাহিনী এনে রমলা নদীর বিস্তৃত ঢালু পাড়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা রমলা দুর্গ ও শহর দখল করে নিল। তারপর তারা শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়লে ক্রুসেড বাহিনীর জালে আটকা পড়ল। সফল হলো ক্রুসেড বাহিনীর চাল।

সুলতান আইয়ুবী ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। তার বাহিনী পালিয়ে যাওয়ারও সুযোগ পেল না। তারা সমানে কচুকাটা হতে লাগল। সুলতান আইয়ুবী কিছু সৈন্য একত্রিত করে তার বিশেষ কৌশল খাটাতে গেল। কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। যুদ্ধের ময়দান খৃস্টানদের হাতেই রইল। তিনি শুধু পরাজিতই হলেন না বরং চারদিক তাকিয়ে দেখলেন, তার পালিয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ।

সুলতান আইয়ুবীর নতুন রিক্রুট করা সৈন্যরা, যারা সহজেই কয়েকটি স্থান দখল করে নিয়েছিল, তারা ভেবেছিল, কেউ তাদের পরাজিত করতে পারবে না। কিন্তু তারা যখন খৃস্টান বাহিনীর সয়লাব ছুটে আসতে দেখল, তখন তারা কেয়ামতের প্রলয় দেখতে পেল। তারা প্রাণ নিয়ে এমন দ্রুত ময়দান ছেড়ে পালালো, যেন তারা হিংস্র বাঘের মুখে পড়ে গেছে। তারা যে পথে এসেছিল, সে পথেই আবার মিশর যাত্রা করলো। যুদ্ধ করার সাধ তাদের জন্মের মত মিটে গেল।

পলাতক সৈন্যদের মধ্যে কোন শৃংখলা ছিল না। অনভিজ্ঞ বালকের মত তারা কেবল প্রাণপণে ছুটছিল।

বিশ্ব বিজয়ী অপরাজেয় বীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ভাগ্য ভাল, খৃস্টান সৈন্যরা পলায়নপর সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করেনি। ফলে কোন ফাঁকে তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়েছিলেন, টের পায়নি কেউ। তাই সে যাত্রা তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার বইতে যুদ্ধের বিবরণ লিখতে

গিয়ে লিখেছেন, 'সুলতান আইয়ুবী আমাকে তার পরাজয়ের কারণ এইভাবে বলেছেন, 'ক্রুসেড বাহিনী আমার যুদ্ধের চাল আমার বাহিনীর ওপর চালিয়ে দিল। তারা ঠিক সেই সময় আমাকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে নিল, যখন আমি ও আমার বাহিনী যুদ্ধের পজিশনে ছিলাম না। দ্বিতীয় কারণ হলো, আমার সেনাবাহিনীর পার্শ্বদেশে যে সেনাদল ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের ব্যস্ততায় ছিল। তারা যখন এলোমেলো অবস্থায়, তক্ষুণি ক্রুসেড বাহিনী আমাদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালালো। তাদের আক্রমণ এত কঠিন ও আকস্মিক ছিল যে, আমাদের নতুন সৈন্যরা ভীত হয়ে পালালো। পিছু হটতে গিয়ে তারা মাঝ পথে পথ হারালো ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি আর তাদের একত্রিত করতে পারলাম না। শত্রুরা আমাদের অনেক সৈন্যকে ধরে যুদ্ধ বন্দী করলো। তাদের মধ্যে সেনাপতি ঈশা আল হেকারীও ছিলেন। আমি অবস্থা বেগতিক দেখে আদেশ দিলাম, যে যেভাবে পারো পালিয়ে যেতে চেষ্টা করো। পথে কোথাও না থেমে সোজা মিশরে চলে যাও।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ আরো লিখেছেন, 'যুদ্ধের পরে সুলতান আইয়ুবী খৃষ্টানদের ষাট হাজার দিনার মুক্তিপণ দিয়ে ঈশা আল হেকারীকে মুক্ত করে আনেন।'

এই যুদ্ধ ৫৭৩ হিজরীর জমাদিউল উলা মুতাবেক অক্টোবর ১১৭৭ সালে সংঘটিত হয়। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিঃসঙ্গ অবস্থায় কায়রো পৌঁছলেন। তাঁর মাথা ছিল অবনত।

তাঁর সাথে কোন সৈন্য ছিল না। এমনকি তাঁর সাথে কোন রক্ষীও ছিল না।
তিনি কায়রো পৌঁছেই আবার নতুন সৈন্য ভর্তি করার আদেশ জারী করলেন। তার ভাই তকিউদ্দিন ও যোগ্য সেনাপতিরা তখন হিম্মত এলাকায়।

০

যে রমলায় আটশো বছর আগে সুলতান আইয়ুবী ক্রুসেড বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, আজও সেই রমলা ইসরাইলীদের দখলে। এই রমলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মাত্র দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত।
কিছুদিন আগেও এই রমলা ছিল জর্দানের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধে ইসরাইল জর্দানের এই অঞ্চল দখল করে নেয়।
জর্দান নদীর পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে ইসরাইলের সীমান্ত পর্যন্ত এই এলাকা বিস্তৃত। যুদ্ধের পর কেটে গেছে তিন যুগেরও অধিক সময়, কিন্তু ইসরাইল এই আরব ভূখন্ড মুক্ত করার পরিবর্তে সেখানে আরও শক্ত করে আসন গেড়ে বসেছে। এখন তারা বলছে, 'দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদের এখান থেকে সরাতে পারবে না।'
তারা রমলার সেই ঐতিহাসিক অঞ্চলকে এখন মুসলমানদের বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে। যেদিন তারা এ অঞ্চল অধিকার

করেছিল, সেদিন থেকেই এ অঞ্চল মুসলমানদের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। গত কয়েক দশক ধরে রমলার বীর মুসলমানরা স্বাধীনতার দাবীতে ইসরাইল সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে। আর ইসরাইলীরা এই সব মুসলমানকে তাদের রাইফেলের টার্গেটে পরিণত করছে।

ইসরাইলের এই একগুঁয়ে মনোভাব প্রমাণ করে, ইসরাইলীরা এ অঞ্চল কোনদিনই মুক্ত করবে না। আরবদের অনৈক্য ও শত্রুতা সহায় হয়েছে তাদের, তাই ক্ষুদ্র একটি দেশ হয়েও তাদের দম্ভের কোন অন্ত নেই। মুসলিম বিশ্ব তাদের ব্যাপারে নির্বিকার। জাতিসংঘ তাদের মদদগার। ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ চক্র তাদের সহায়। তাই আজো মানবতা মরুভূমির বিস্তৃত প্রান্তরে হাহাকার করে মরছে। মানবতা কাঁদছে বিশ্বের অলিতে গলিতে। পৃথিবীতে আজ মুসলমানের অভাব নেই। অভাব নেই তাদের সহায় ও সম্পদের। কিন্তু একজন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অভাবে কাঁদছে জগত-সংসার। কাঁদছে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, মিন্দানাও, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা।

কিন্তু আটশো বছর আগে যখন এই এলাকা খৃস্টান বাহিনীর অধিকারে চলে যায়, তখন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এক মুহূর্তের জন্য শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার কোন সময় পাননি তিনি। রমলার নির্যাতীত মানুষের কান্না তার রাতের আরাম ও দিনের বিশ্রাম হারাম করে দিয়েছিল। মজলুম মানুষের হাহাকার ছিনিয়ে নিয়েছিল তার সব সুখ ও শান্তি।

যুদ্ধের ময়দান থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেই তিনি আবার নতুন সৈন্য ভর্তির হুকুম দিয়েছিলেন। কষ্ট ও বিপদের বোঝা মাথায় চেপে থাকলেও হতাশা গ্রাস করতে পারেনি তাকে। পরাজয়ের গ্লানিকে তিনি উদ্যমের শাণিত তরবারী দিয়ে কেটেকুটে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

তাঁর সেনাদল যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছিল মিশরে। যারা আসতে পারেনি তারা খৃস্টান বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিল। আর অবশিষ্ট সৈন্যরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে লালে লাল করে দিয়েছিল রমলার বিশাল প্রান্তর।

কিন্তু সুলতান আইয়ুবী মিশরে ফিরে এসে শুধু গুছিয়েই নেননি বরং তিনি পরাজিত এলাকায় আবার বীর বেশে ছুটে গিয়েছিলেন। যে ক্রুসেড বাহিনী তাঁর ওপর ঝড়ের মত আপতিত হয়েছিল তাদের ওপর তিনি কিয়ামত চাপিয়ে দিয়েছিলেন। রমলা আজ আবার তাকিয়ে আছে তেমনি এক নব্য সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পথের পানে। তেমনি এক বীর আবার কখন রমলার অশ্রু মুছিয়ে দিতে ছুটে আসবে এই প্রশ্ন এখন বিশ্বের বিবেকবান প্রতিটি মানুষের মনে।

সুলতান আইয়ুবীর সামনে সেদিন শুধু এই প্রশ্নই ছিল না, তিনি পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবেন এবং ক্রুসেড বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবেন। বরং বহু বিপদ ও মুসিবত তাকে ঘেরাও করে ধরেছিল। সে সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই তাকে সামনে অগ্রসর হতে হচ্ছিল।

যে অগণিত বিপদ বাঁধা মোকাবেলা করে তাঁকে অগ্রসর হতে

হচ্ছিল, তার এক নম্বরে ছিল বিশ্বাসঘাতকদের ভয়। কারণ বিশ্বাসঘাতকরাই যুগে যুগে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

এ ছাড়া ছিল সুদানের দিক থেকে আক্রমণের আশংকা। কারণ সুদানীরা জানতো, সুলতান আইয়ুবীর কাছে বেশী সৈন্য নেই। যে সব সৈন্য আছে, তারা পরাজিত ও ভগ্ন হৃদয় এবং আহত।

সবচে ভয়ংকর ও বেশী ভয়ের কারণ ছিল ক্রুসেড বাহিনী। কারণ তারা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী। তারা রমলায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল।

এ ছাড়া ছিল সেই সব মুসলমান আমীর ও সুলতানদের ভয়, যারা সুলতান আইয়ুবীর বিরোধী ছিল। তারা সুলতানের পরাজয়ে যেমন খুশী হয়েছিল তেমনি আশায় ছিল, যদি সুযোগ পাওয়া যায় তবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁকে আবার পরাজিত করবে।

আরও একটি আশংকার কারণ ছিল খৃস্টানদের গোয়েন্দা তৎপরতা। হরমনের দক্ষ হাতের পরিচালনায় সে সময় এ ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল। চারদিকে শক্ত জাল বিছিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তারা জনগণের মধ্যে মিশে গিয়ে জনমনে গুজব ছড়িয়ে জাতির মনোবল ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সুলতান আইয়ুবীর ভাই সুলতান

তকিউদ্দিন হিম্মত দুর্গ ছেড়ে হিম্মত পর্ব্বত চূড়ায় উঠে যান তার বাহিনী নিয়ে। তিনি আশংকা করলেন, ক্রুসেড বাহিনী এই বিজয়ের পর হিম্মত দুর্গ অবরোধ করে বসতে পারে।

তার আশংকা সত্যে পরিণত হলো। ক্রুসেড বাহিনী সুলতানকে পরাজিত করে হিম্মতের দিকে অগ্রসর হলো।

তকিউদ্দিন তার ভাইয়ের মতই যোগ্য সেনাপতি ছিলেন। তার সঙ্গী-সাথী সেনাপতিরাও ছিল রণ-নিপুন, বীর এবং মর্দে মুজাহিদ। সুলতান আইয়ুবীর মতই দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিল এরাও। কারণ, তকিউদ্দিনসহ এরা সবাই ছিল সুলতান আইয়ুবীর শাগরেদ। যুদ্ধের কলা-কৌশলও তারা শিখেছিল আইয়ুবীর কাছ থেকেই।

তকিউদ্দিন ও তাঁর সাথীরা একমত হলো, ক্রুসেড বাহিনী এত বড় ও এত সহজ বিজয় লাভের পর শুধু রমলা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। রমলা জয়ের পর তাদের প্রথম টার্গেট হবে হিম্মত।

তিনি তাঁর গোয়েন্দাদেরকে ছদ্মবেশে রমলার পথে পথে ছড়িয়ে পড়তে বললেন। এর মধ্যেই তিনি খবর পেয়ে গেলেন, তার ভাই সুলতান আইয়ুবী মিশরে চলে গেছেন।

তাঁদের ধারণা সঠিক ছিল। গোয়েন্দা এসে সংবাদ দিল, ক্রুসেড বাহিনী হিম্মতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তকিউদ্দিন তার সৈন্যদের অবস্থা দেখলেন। আইয়ুবীর পরাজয় সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল। যে বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে তার মোকাবেলায় তাদের ঘোড়া এবং

উটের সংখ্যাও কম। খাদ্য শস্যের মজুতও সন্তোষজনক নয়। সুতরাং বাস্তব অবস্থা সামনে রেখেই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন।

তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে সেই এলাকায় সরিয়ে নিলেন, যেখানে সবুজ মাঠ ছিল। খাওয়ার মত পর্যাপ্ত পানি ছিল, আর এলাকাটি ছিল পাহাড় পরিবেষ্টিত। তকিউদ্দিন সৈন্যদেরকে এক স্থানে একত্রিত করলেন।

তিনি যুদ্ধের সরঞ্জাম ও পশুর তদারকী করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, তার ধারনার চাইতেও বেশী উট আহত। তিনি সে উটগুলো জবেহ করে সৈন্যদের বললেন, 'তোমরা পেট ভর্তি করে উটের গোস্ত খাও।'

মুহূর্তে সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এ খুশীর খবর। সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্যম ফিরে এলো। রাতে তারা এক বিশাল ময়দানে উটের গোস্ত খাওয়ার উৎসবের আয়োজন করলো। সেই সন্ধ্যায়ই তিনি হলব ও দামেশকে কাসেদ মারফত সংবাদ পাঠালেন, 'তোমরা যে পরিমাণ রসদ, পশু ও অস্ত্র সম্ভব হয়, জলদি পাঠাও।'

রাতের উৎসব জমে উঠল। সৈন্যরা পেট ভরে তৃপ্তির সাথে উটের গোস্ত আহার করল। খাওয়া দাওয়ার পর সুলতান তকিউদ্দিন এক উঁচু স্থানে উঠে দাঁড়ালেন। তার ডানে ও বায়ে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে গেলো দুই রক্ষী সেনা।

তিনি বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'আল্লাহ ও রাসূলের বীর মুজাহিদবৃন্দ! তোমরা এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নাও যে,

আমরা যে কারণেই হোক পরাজিত হয়েছি। তোমরা কি এই পরাজিত অবস্থায় তোমার মায়ের সামনে, তোমার বোনের সামনে, তোমার বিবি ও বাচ্চাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চাও? তোমরা কি তাদেরকে এই কথা শোনাতে চাও, আমরা আমাদের রাসূলের বিরোধীদের হাতে পরাজিত হয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছি? তোমরা কি মনে করো, এই খবর পেলে তারা খুশী হবে? নাকি তোমাদের মায়েরা দুধের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, পরাজয়ের খবর শোনানোর জন্যই কি আমরা তোমাদের বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছিলাম?'

তিনি একটু দম নিলেন। তারপর আবার সেই দরাজ গলায় বললেন, 'তারা এই আশা নিয়ে ঘরে বসে আছে যে আমাদের প্রথম কেবলা কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত করতে আমার যে সন্তানেরা ছুটে গেছে, একদিন বিজয়ের পতাক উড়িয়ে তারা আবার ফিরে আসবে। তারা এ কথাও জানে, যে এলাকায় কাফেররা পা রাখে, সেখানে তারা মুসলমা মেয়েদের সম্মান ও সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে। আজ রমলায় লুণ্ঠি হচ্ছে তাদের ইজ্জত, এই ঝড়ের গতি থামাতে না পারলে কাল লুণ্ঠিত হবে আমার মা ও বোনের সম্মান।

বন্ধুরা আমার! একটু গভীর ভাবে চিন্তা করো, যদি কখনে এমন দিন তোমার সামনে আসে, সে দিন কি তুমি তোমার মা ও বোনদের সামনে মুখ দেখাতে পারবে? তাই আমি বলতে চাই, আজকের এ লড়াই, আমাদের ইজ্জত ও মর্যাদা লড়াই। আজকের এ লড়াই আমাদের অস্তিত্বের লড়াই

আজকের এ লড়াই আমাদের ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষার লড়াই।

আমি কাউকে জোর করে লড়াইয়ের ময়দানে টেনে নিতে চাই না। জোর করে কাউকে ধরে রাখতে চাই না, সত্যের এ কাফেলায়। হকের পথে এগিয়ে যাওয়ার হিম্মত যাদের আছে, তারা আমার সামনে বসো। যারা মৃত্যুকে ভয় পাও, যারা লড়াই ছেড়ে প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে চাও, তারা পৃথক হয়ে যাও। আমি স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। তোমাদের বাড়ী যাওয়ার পথে কেউ বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না, এই নিশ্চয়তাও দিচ্ছি তোমাদের। এখন আমি তোমাদের সরে দাঁড়ানোর সুযোগ দিচ্ছি। উঠে দাঁড়াও এবং একদিকে সরে যাও তোমরা।'

সুলতান তকিউদ্দিন চুপ করলেন। তাকিয়ে রইলেন সৈন্যদের দিকে। সৈন্যদের মাঝেও বিরাজ করছিল অখণ্ড নীরবতা। একটি সৈন্যও উঠে দাঁড়াল না। কেউ পৃথক হলো না সেই যুথবদ্ধ সমাবেশ থেকে। এভাবেই কেটে গেল বেশ কিছু সময়।

তখন দেখা গেল সমাবেশের সামনের সারি থেকে একজন উঠে দাঁড়াল। সে পিছন ফিরে সৈন্যদের মুখোমুখি হলো। বললো, 'তোমরা কেউ বাড়ী ফিরে যেতে চাও?'

রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে সমবেত কণ্ঠের সম্মিলিত ধ্বনি ভেসে এলো, 'না, আমরা কেউ ময়দানে পিঠ দেখানোর জন্য এখানে আসিনি।'

তখন সেই লোক ঘুরে দাঁড়ালো সুলতান তকিউদ্দিনের দিকে। বললো, 'আমাদের প্রাণপ্রিয় সেনাপতি! আপনাকে কে বলেছে, আমরা বাড়ী চলে যেতে চাই? আপনি আপনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন! কোন্ কঠিন ময়দানে আমাদের নিয়ে যেতে চান, নির্দেশ করুন। আপনি আমাদেরকে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে বললে আমরা তাই করবো। যদি আপনি বলেন আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে, আমাদের একজনও পিছন ফিরে তাকাবে না। আমরা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবো।'

পিছন থেকে আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যদি আমরা পিছু হটে মারা যাই, তবে যেন আমাদের লাশ দাফন করা না হয়। আমাদের লাশ যেন শকুন ও শিয়ালের জন্য ফেলে রাখা হয়।'

আরও কয়েকটি ধ্বনি শোনা গেল সমবেত সৈন্যদের মধ্য থেকে। প্রত্যেকেই কথা বলছিল আবেগময় স্বরে এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে।

তকিউদ্দিনের বুক ফুলে উঠলো। তিনি সৈন্যদের বললেন, 'তোমাদের শত্রুরা এগিয়ে আসছে। তোমাদের প্রমাণ করতে হবে, রমলাই তাদের শেষ বিজয়। আজ রাত ও কালকের দিনটা পূর্ণ বিশ্রাম করো। কাল রাতে আমি তোমাদের বলবো, তোমাদের কি করতে হবে এবং আমরা কি করতে চাই।'

তকিউদ্দিন সৈন্যদের থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর ক্যাম্পে সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের ডাকলেন। তাদের তিনি বললেন,

আগামীকাল রাতে তিনি কি করতে চান এবং এই সেনাবাহিনীকে কোথায় নিয়ে যেতে চান। হিম্মতের দুর্গ সেখান থেকে কাছেই ছিল। কিন্তু তিনি সেই দুর্গে আশ্রয় নিলেন না, সেনাবাহিনীকেও সেখানে যেতে দিলেন না।

ক্রুসেড বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সম্রাট বিলডন। তিনি জানতেন, সামনেই হিম্মত দুর্গ। এ দুর্গে অবস্থান করছে সুলতান আইয়ুবীর ভাই সুলতান তকিউদ্দিন। আইয়ুবীর পরাজয়ের পর এবার তার পালা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে তার ভাইয়ের পরাজয়ের খবর পেয়েছে। সেই খবরে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। সে যখন দেখতে পাবে, আইয়ুবীকে যারা পরাজিত করেছিল সেই বীর বাহিনী এসে তাকে অবরোধ করে বসেছে, ভয়ের চোটেই সে হয়তো হাতিয়ার সমর্পণ করে দেবে।

খৃস্টান সম্রাট বিলডন এই আশা নিয়েই বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়ে হিম্মত দুর্গ অবরোধ করে বসলো। অবরোধ করার পর তারা ঘোষণা করল, 'কেল্লার দরজা খুলে দাও, নইলে এ কেল্লা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হবে।'

তারা ভেবেছিল, সুলতান তকিউদ্দিনের হাতে যুদ্ধ করার মত তেমন সৈন্য নেই। ফলে এ ঘোষণা শুনেই সে হাতিয়ার সমর্পন করে দেবে। কিন্তু দেখা গেল, হাতিয়ার সমর্পন করার জন্য কেউ এগিয়ে এলো না। এমনকি কেউ তাদের আহ্বানের কোন জবাবও দিল না।

ধাঁধাঁয় পড়ে গেল বিলডন। এমন তো হওয়ার কথা নয়! কেউ

আত্মসমর্পনের জন্য এগিয়ে আসছে না কেন?

বিলডন আবার ঘোষণা করল, 'বৃথা রক্ত প্রবাহিত করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনো না। হাতিয়ার সমর্পন করো। এখন আর লড়াই করে কোন লাভ হবে না, কেবল রক্ত ক্ষয় করবে। এ রক্ত তোমাদের কোন কাজে আসবে না। তোমরা যুদ্ধ করে জিততে পারবে না। তাই বিনা যুদ্ধেই দুর্গটা আমাদের কাছে সমর্পণ করো। আমি অঙ্গীকার করছি, কোন বন্দীর সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার উপর থেকে উত্তর এলো, 'সাবধান! আমাদের তীরর আওতা থেকে দয়া করে দূরে থাকো। কারণ আমাদের তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এ দুর্গ কোনদিনই তোমরা হাতে পাবে না। প্রয়োজনে এ কেল্লা আমরা নিজ হাতে ধ্বংস করে দেবো, কিন্তু তোমাদের হাতে দেবো না। আর আমাদের রক্ত! আমাদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না। আমরা জানি, আমাদের রক্ত শরীরে থাকলে যেমন লাভ, শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে আরো লাভ। আমাদের দেহের প্রতি ফোটা রক্ত তখন আমাদের বেহেশতের জামিন হয়ে যায়। উদ্দেশ্যহীনভাবে আমরা রক্ত দেই না, বরং তোমরাই লড়াই করতে নেমে অনর্থক মারা যাও।'

দুর্গ প্রাচীরে যে সব সৈন্য দাঁড়িয়েছিল, তারা দেখতে পেল, ক্রুসেড বাহিনী কেল্লার চারদিকে সাগরের তরঙ্গের মত ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তাল তরঙ্গ যেমন বড় বড় পাথর গ্রাস করে তলিয়ে দেয় পানির নিচে, তেমনি এ কেল্লাকে যেন ওরা

গ্রাস করে নেবে।

এদের মোকাবেলায় কেল্লায় যে পরিমাণ সৈন্য ছিল, তা অতি নগণ্য। কিন্তু এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়েই সত্যের মুজাহিদ লড়াই করার জন্য ইস্পাতকঠিন সংকল্প ঘোষণা করল। কেল্লার কমাণ্ডার অস্ত্র সমর্পণ করতে কিছুতেই রাজী না হওয়ায় স্তম্ভিত হয়ে গেল বিলডন।

সুর্য ডুবে যাচ্ছিল। ক্রুসেড বাহিনী রাতের অন্ধকারে হামলা করার ঝুঁকি নিল না। তারা ভাবল, রাত কাটুক, কাল ভোরে ধীরে সুস্থে ওদের পাকড়াও করলেই হবে।

এমনিতেই দীর্ঘ পথ মার্চ করে এসে তারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সৈন্যদেরকে আর কষ্ট দিতে চাচ্ছিল না বিলডন। তার মাথায় তখন একটাই চিন্তা, কি করে সুলতান তকিউদ্দিনকে জীবিত ধরা যায়। কারণ, সুলতান আইয়ুবীর ভাই হিসেবে তকিউদ্দিন খুবই মূল্যবান কয়েদী হবে। তাঁর বিনিময়ে ভাল শর্ত আদায় করা যাবে। চাই কি, কোন অঞ্চলও পেয়ে যেতে পারি।

বিলডনের মনে পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস ছিল, এই কেল্লা ও কেল্লার সৈন্যদের তিনি সহজেই গ্রেফতার করতে পারবেন।

০

সম্রাট বিলডন তাঁর সৈন্য বাহিনীকে কেল্লা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এখন কেল্লা থেকে তীর বর্ষণ করলেও সে তীর এখানে পৌঁছতে পারবে না। তাদের মনে এমন কোন

আশংকাই ছিল না, কোন সেনাদল বাইরে থেকে তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।

তারা এই ভেবেও অনেকটা স্বস্তি অনুভব করছিল, সুলতান আইয়ুবী এখানে নেই। তাঁর সেনাবাহিনীও না। বিলডন কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছিল, হিম্মত দুর্গের পতন হয়েছে। সেখানে শোভা পাচ্ছে তার নিশান। বাহ্যত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হিম্মত দুর্গের পতন সামান্য সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সন্ধ্যার পর তিনি তার কমাণ্ডারদের পরবর্তী দিনের কার্যাবলী বুঝিয়ে দিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলেন। তার জন্য তাঁবু খাটানো হলো সৈন্যদের ঘাঁটি থেকে কিছু দূরে। সে যুগে যুদ্ধের সময়ও সম্রাটদের তাঁবু খাটানো হতো আলীশান মহলের মত করে। সেখানে থাকতো সম্রাটদের আনন্দ ও বিনোদনের ব্যবস্থা।

বিলডন যেহেতু একজন বিজয়ী সম্রাট, তাই তার ক্যাম্পও সেভাবেই সাজানো হলো। তার মনোরঞ্জনের জন্য পাঠানো হলো চারটি খৃস্টান মেয়ে ও চারজন মুসলমান মেয়ে। এই মুসলমান মেয়েদের ধরে আনা হয়েছিল বিজিত এলাকা রমলা থেকে। এ মেয়েদের সবাই ছিল অভিজাত ঘরের সন্তান। তারা কেবল যুবতীই ছিল না, ছিল নজরকাড়া সুন্দরীও।

খৃস্টান মেয়েরা তাদের বলছিল, 'এখন কান্নাকাটি করে কোন লাভ হবে না। তোমাদের মুক্ত করার জন্য ছুটে আসবে না কোন রাজপুত্তুর। তাই বৃথা চেষ্টা করো না।'

তাদেরকে আরও বলা হলো, 'আরে, তোমরা তো ভাগ্যবতী

মেয়ে! কোন সাধারণ সেপাই বা কমাণ্ডার নয়, তোমরা স্বয়ং সম্রাটের নজরে পড়েছো।'

আরেক মেয়ে তাদের বলছিল, 'মহাপ্রভুর শুকরিয়া আদায় করো। যেসব মেয়েরা খৃস্টান সেনাদের কবলে পড়েছে, তারা এখন বুঝতে পারছে, দুনিয়া কত ভয়ংকর! তারা এখন বার বার হাত বদল হচ্ছে, আর তাদের চিৎকারে জমিন ও আসমান কেঁপে উঠছে।'

অন্য মেয়ে বলছিল, 'তোমাদের ভাগ্যে বড়জোর কোন আমীর বা মুসলমান অফিসার জুটতো! সেখানে তুমি খৃস্টান সম্রাটের সঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছো, এটা কি কম কথা!'

'আরে, মুসলমান আমীর ও নবাবজাদাদের স্বভাব আমার জানা আছে। দু-চার বছর পর যৌবনে ভাটা পড়লে আপন বিবিকেও তারা বণিকের কাছে বিক্রি করে দেয়।' বলছিল আরেকজন।

মুসলমান চার মেয়ে চুপচাপ সহ্য করে যাচ্ছিল এই বাগাড়ম্বর। এ ছাড়া তাদের করার কিছুই ছিল না। খৃস্টান এক মেয়ে এ সময় আবার বলে উঠল, 'শুনেছি সম্রাট তাদের বিয়ে করে বউ বানাবে। আহলে কিতাবদের মধ্যে বিয়ে জায়েজ করা হয়েছে কোরানেও। সুতরাং তোমাদের আর অসুবিধা কি!'

এ সময় এক মুসলমান মেয়ে বলে উঠল, 'খোদার দোহাই লাগে, ভণ্ডামী করার জন্য ধর্মকে টেনে এনো না।'

ফোঁস করে টিপ্পনি কাটল এক খৃস্টান মেয়ে, 'ঠিকই তো

বলেছে সে। শুধু শুধু ধর্ম নিয়ে টানাটানি করছিস কেন! মেয়েদের আবার ধর্ম কি! মেয়েরা তো পানির মত। যেই পাত্রে রাখো সেই রং ধারণ করে। মেয়ে মানুষও তেমনি। স্বামী হোক আর যেই হোক, যার অধীনে সে থাকে, সেই মানুষটাই তার প্রভু। সে লোকের ধর্মই তার ধর্ম। যে ব্যক্তি দেশের রাজা তিনি তো আমাদের দেহেরও রাজা, মনেরও রাজা।'

এ ভাবেই চার মুসলিম মেয়েকে বিপথগামী করার জন্য চার খৃস্টান মেয়ে উঠেপড়ে লাগল। বিলডন তাদের ডেকে বলল, 'এই মেয়েদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করবে না। তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে না। কোন রকম কষ্ট দেবে না। তাদেরকে কখনো ধমক দিয়ে কথা বলবে না।' বিলডন আরো বলল, 'এরা খুবই সুন্দরী ও নব যুবতী। এদেরকে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমি এই মেয়েদেরকে শুধু বিলাস ও ভোগের সামগ্রী বানাতে চাই না। দরকার হলে এদের সাথে আপন কন্যাদের মত ব্যবহার করো। দরকার হলে ওদের উত্তম বান্ধবী হও তোমরা। তাদেরকে রাজকুমারীর মত বিলাস সামগ্রী সরবরাহ করো। তাদের মনে স্বপ্নের আলপনা আঁকো! কথায় কথায় তাদেরকে আকাশের তারা বানিয়ে দাও।'

এই চার মুসলিম মেয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এক মেয়ে বলল, 'ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে আমাদের সম্ভ্রমের কোরবানী দিতেই হবে।'

'তার আগে আমরা এদের হাত থেকে পালাতে পারি না?'

'সেটা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। তারচে এখানে থেকেই এদের ওপর আমাদের প্রতিশোধ নেয়া উচিত।' অপর মেয়ে বললো।

'কিন্তু প্রতিশোধ নেয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত ওরা আমাদেরকে তাদের প্রতি আন্তরিক ও বিশ্বস্ত না পাবে।' প্রথম মেয়েটি বললো, 'ওদেরকে বুঝাতে হবে, আমরা ওদের বশ্যতা মেনে নিয়েছি এবং তাদের ভাগ্যের সাথেই আমাদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছি।'

'আমার পিতা সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনীতে আছেন।' অপর মেয়েটি বললো, 'তিনি বর্তমানে মিশরে আছেন। তিনি বলেছিলেন, কাফের মেয়েরা জাতির জন্য তাদের মান-সম্ভ্রম পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়। তারা আমাদের বড় বড় আমীর ও অফিসারদের হাতে তাদের ইজ্জত তুলে দিয়ে তাদেরকে ক্রুসেড বাহিনীর তাবেদার বানিয়ে নেয়। যদি কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকে, সেই তাবেদারকে দিয়েই তাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। আমাদের সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য জেনে নিয়ে তারা খৃস্টানদের কাছে পৌঁছে দেয়।'

'আমি তা জানি।' তার সাথী অন্য মেয়েটি বললো, 'সেই মেয়েরা এমন কাজ করে যা আমাদের পুরুষ গোয়েন্দারা শত্রুর দেশে গিয়ে করে থাকে।' এ কথা বলেই সে চুপ হয়ে গেল এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করলো আশেপাশে কেউ আছে কিনা, কেউ গোপনে তাদের কথা শুনছে কিনা।

আশেপাশে কেউ নেই দেখে সে বললো, 'যদি আমরা বলি, আমরা তাদের বশ্যতা মেনে নিয়েছি, তাতে এমন সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে, আমরা একদিন সম্রাটকেও হত্যা করতে পারবো।'

'আর কিছু না হোক পালানোর সুযোগ তো পাবো।' অন্য মেয়েটি বললো।

যে রাতে বিলডনের সেনাবাহিনী হিম্মাত দুর্গ অবরোধ করেছিল, তার দুই রাত আগের কথা। মুসলমান মেয়েরা খৃস্টান মেয়েদের বলল, 'আচ্ছা, আমরা বিধর্মী হওয়ার পরও তোমরা আমাদের এমন আদর যত্ন করো কেন?'

'বাহ, তাতে কি হয়েছে, তোমাদের আর আমাদের খোদা তো একজনই। তোমাকে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে, আমাকেও তো সে আল্লাহই বানিয়েছে। তাহলে ধর্মের কারণে আমরা তোমাদের দূরে ঠেলে ফেলবো কেন?'

'ভাল কথা বলেছো তো! তোমরা যদি আমাদের এতটাই আপন করে নিতে পারো, তাহলে আমরাই বা দূরে থাকবো কেন? আমরা যদি আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে চাই, সে সুযোগ আমাদের দেবে?'

'কেন নয়? তোমরা চাইলে অবশ্যই তা সম্ভব।'

খৃস্টান মেয়েরা তখনি সে কথা সম্রাট বিলডনকে জানালো। খুশী হয়ে সম্রাট বিলডন চার মেয়েকে চারটি মূল্যবান হার দান করলেন। তারপর তাদের ডেকে চার মেয়ের গলায় ছোট ছোট চারটি ক্রুশ ঝুলিয়ে দিলেন।

কিন্তু তিনি খৃস্টান মেয়েদের আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি এই চারজনের হাতে কোন খানাপিনা করবো না। কারণ তারা ভয়ের কারণে ধর্ম পরিবর্তন করেছে, নাকি মন থেকে করেছে, আগে বুঝতে হবে। ধর্ম পরিবর্তনের কথা মুখে বলা যত সহজ মন থেকে মেনে নেয়া তত সহজ নয়। তবে তারা যখন বলেছে, তাদের মন জয় করতে চেষ্টা করো। মুসলমানকে কেনা সহজ কিন্তু তাকে বিশ্বাস করা ও তার উপর ভরসা করা কঠিন ব্যাপার! যে মুসলমান বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী, তারা এমন কঠিন কঠিন কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এই মেয়েদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখবে, যেন কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে। সতর্ক থাকবে, যেন সুযোগ মত আমাদের উপর আঘাত হেনে ক্ষতি না করে।'

০

অবরোধের প্রথম রাত। এই চার মেয়ে পৃথক এক তাঁবুতে শুয়ে ছিল। বিলডনও তাদের সাথে কিছুক্ষণ হাসি-তামাশা করে নিজের তাবুতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

কমাণ্ডার ও সৈন্যরা ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে শোয়ার সাথে সাথেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। শুধু ক্যাম্প প্রহরী ও বিলডনের দেহরক্ষী চার-পাঁচজন জেগে ছিল।

হিম্মত পর্বতশৃঙ্গের পাশে এক সবুজ শ্যামল প্রান্তর। এই প্রান্তরে কমবেশী এক হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে ঘাপটি

মেরে বসেছিলেন সুলতান তকিউদ্দিন। রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এলো। রাত বাড়তে লাগল একটু একটু করে। মধ্যরাতের সামান্য আগে সুলতান তকিউদ্দিন গোপন সংকেত দিলেন।

আস্তে পা টিপে টিপে সেই প্রান্তর থেকে গোপনে বের হয়ে গেল সেই সেনাবাহিনী। কমাণ্ডার তাদেরকে ছোট ছোট সৈন্য দলে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দিলো। রাতের নিস্তব্ধতা যেন নষ্ট না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেই কাফেলা। তারা সামনে অগ্রসর হয়ে বিলডনের সেনা ক্যাম্প ঘেরাও করে দাঁড়াল।

এই সে সেনাদল, যাদেরকে নিয়ে তকিউদ্দিন হিম্মত কেল্লা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কেল্লায় সামান্য সৈন্যই রেখেছিলেন তিনি। তার বিশ্বাস সত্যে পরিণত হলো। তিনি ধারণা করেছিলেন, ক্রুসেড বাহিনী হিম্মত কেল্লা অবরোধ করবে। সুতরাং তিনি তার মূল সেনাশক্তি হিম্মত পর্বতের পাশে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কেল্লায় যারা ছিল তাদের অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'খৃস্টান বাহিনী তোমাদের অবরোধ করলে ভয় পেয়ো না। তাদের সাথে তোমাদের নয়, লড়াই হবে আমাদের। ওরা তোমাদের অবরোধ করলে আমরা তাদের ওপর মরু সাইমুমের ঝড় হয়ে ছুটে আসবো।'

এ জন্যই কেল্লাধিপতি ক্রুসেড বাহিনীর চ্যালেঞ্জের বীরোচিত উত্তর দিয়েছিলেন। তার বলিষ্ঠ ভাষা ও সাহসিকতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সম্রাট বিলডন।

এই কেল্লার অধিপতি ছিলেন তকিউদ্দিনের মামা শিহাবুদ্দিন আল হাশমী।

রাতে তকিউদ্দিনের এক হাজার পদাতিক সৈন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে কমাণ্ডো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। তারপর তকিউদ্দিনের ইঙ্গিত পাওয়ার সাথে সাথে প্রথমে তারা তাঁবুর রশি ও দড়িদড়া দ্রুত হাতে কেটে ফেললো। তারপর ওপর থেকে বর্শাবিদ্ধ করে মাছ মারার মত ক্রুসেডদের বিদ্ধ করতে লাগলো। তাঁবুর নিচে ঘুমন্ত সৈন্যরা টেরই পেল না, কোন ফাঁকে মৃত্যু এসে তাদের পরপারে পাঠিয়ে দিল।

এরা এই যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে। আইয়ুবী এই যুদ্ধের নাম দিয়েছিল, 'আঘাত করো আর পালাও!'

এতবড় বিশাল বাহিনীর সাথে মাত্র এক হাজার পদাতিক সৈন্যের সম্মুখ লড়াইয়ের প্রশ্নই আসে না। যত বড় বীর আর যোদ্ধাই হোক, হাজার হাজার মৌমাছি আঁকড়ে ধরলে সেও কুপোকাত হয়ে যায়। এই বিশাল বাহিনীর সামনে তকিউদ্দিনের বাহিনীর অবস্থা ছিল অনেকটা সেরকম।

তাই তকিউদ্দিন সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন গ্রুপের ওপর আলাদা দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

কিছু গ্রুপের ওপর দায়িত্ব ছিল, ক্যাম্প প্রহরীদেরকে কোন রকম আওয়াজ করার সুযোগ না দিয়ে গায়েব করে ফেলা।

কিছু গ্রুপ শত্রুদের ঘোড়া, উট ও খচ্চরের বাঁধন কেটে দেয়ার দায়িত্ব পেয়েছিল। এ দুই কাজে শ'দুই সৈন্য রেখে বাকী আটশো সৈন্যকে তিনি প্রস্তুত রেখেছিলেন মূল আক্রমণের জন্য। এই আটশো সৈন্য ধূমকেতুর মত ঘুমন্ত বাহিনীর ওপর টুটে পড়লো। চোখের নিমিষে তারা এমন ত্রাস সৃষ্টি করলো যে, ক্রুসেড সৈন্যদের আতংকিত আর্ত চিৎকারে পুরো এলাকা নরক গুলজার হয়ে উঠল। তাদের আর্তনাদের ধ্বনি দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো। তখনো যারা আক্রান্ত হয়নি তারা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে তাবুর বাইরে এসে দেখলো, কেয়ামতের প্রলয় শুরু হয়ে গেছে ক্যাম্পে। সহসা তারাও আর্ত চিৎকার দিয়ে ছুটাছুটি শুরু করল প্রাণ নিয়ে পালাতে। কিন্তু চিতাবাঘের মতই ক্ষিপ্রগতিতে তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ছিল মরণজয়ী মুজাহিদরা। সহসা যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল ক্যাম্পে। আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠলো মানুষ ও পশুর সম্মিলিত চিৎকারে।

সম্রাট বিলডন চোখ খোললেন। তার কমাণ্ডাররাও জেগে উঠলো। তাঁবুর বাইরে গিয়ে দেখতে পেলো, সেনা ক্যাম্পের তাঁবুতে সর্বত্র শুধু আগুন জ্বলছে। তকিউদ্দিনের পদাতিক বাহিনীর ছোট ছোট দলগুলো দ্রুত আঘাতের পর আঘাত করছিল আর সাথে সাথে তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। তারা আঘাত করছিল আর তাকবীর-ধ্বনি দিচ্ছিল।

এই ধ্বনি অন্য সবার মত সেই চার মুসলিম মেয়েও শুনতে পেলো। তারা বুঝতে পারলো, রাতের আঁধারে যে ফৌজ এই

সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা মুসলমান।
তারা চারজন একই তাঁবুতে ছিল। একজন বলে উঠল, 'চলো পালিয়ে যাই।'
'না, আমি পালাবো না। আমার বুকের মধ্যে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছে, এখন আমি সেই আগুন নেভাবো। আমি সম্রাট বিলডনকে হত্যা করবো।'
বিলডনের তাবু সেনা ক্যাম্প থেকে একটু দূরে ছিল। সেখানে মশাল জ্বলছিল। বিলডনের দেহরক্ষীরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে তার চারপাশে পাহারা দিচ্ছিল।
সহসা কেঁপে উঠলো সেখানকার মাটি। হাজার হাজার দুরন্ত অশ্বের মিলিত পদধ্বনি শোনা গেল। এগুলো ছিল তকিউদ্দিনের অশ্বারোহী বাহিনী। এই অশ্বারোহীর সংখ্যা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দুই হাজার বলে উল্লেখ করেছেন, আর খৃস্টান ঐতিহাসিকরা চার হাজার বলেছেন। এই অশ্বারোহী বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্রুসেড বাহিনীর ওপর। এদের মোকাবেলা করার কোন প্রস্তুতিই ছিল না ক্রুসেড বাহিনীর। তারা তখনও জানতেও পারেনি, কি হচ্ছে আর কারা তাদের আক্রমণ করেছে। শুধু তাদের তকবীর ধ্বনি থেকে বুঝা যাচ্ছিল, এরা মুসলমান।
তকিউদ্দিনের অশ্বারোহীরা ক্রুসেড বাহিনীর ক্যাম্প ছিন্নভিন্ন করে হাতের কাছে যেখানে যাকে পেল ঘোড়ার পদতলে পিষে ফেলতে লাগল। যারা ঘোড়ার পায়ের তলে পড়েনি তাদেরকে তলোয়ারের আঘাতে পরপারে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। কেউ আবার

বর্শায় বিদ্ধ করে তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছিল মৃত্যুর কোলে। প্রায় এক ঘন্টা এই তুফান চালানোর পর হঠাৎ কমাণ্ডার ফিরে যাওয়ার সংকেত দিল। সাথে সাথে অশ্বারোহী বাহিনী উধাও হয়ে গেল ময়দান থেকে।

বিলডনের মনে হলো, সে ভয়ংকর কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে। এটা যে বাস্তব তাই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে দেখতে পেল, কোন প্রতিরোধ ছাড়াই একদল অশ্বারোহী এলো এবং স্বাধীনভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে চোখের নিমিষে আবার হাওয়া হয়ে গেল।

ক্রুসেড বাহিনী হিম্মত দুর্গ অবরোধ করে নিয়েছিল। সে কারণে দুর্গের দুই পাশেই তারা ক্যাম্প করেছিল। এক পাশে যখন এই কেয়ামত চলছিল কেল্লার অপর পাশের ক্রুসেড বাহিনী তখনো ছিল আক্রমণের বাইরে। তারা এদিকে শোরগোল শুনতে পেল। শুনতে পেল আহত ও মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের মরণ চিৎকার। এদিকের যে দু'চার জন সৈন্য এই বিভীষিকার হাত থেকে নিজেকে কোন মতে বাঁচাতে পারল তারা ছুটল অপর পাশের সেনা ক্যাম্পে।

সেখানে পালিয়ে যারা আশ্রয় নিল তাদের কাছে ওরা জানতে চাইল কি ঘটেছে। কিন্তু ওরা যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল প্রথমে ওরা কিছুই বলতে পারল না। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে একজন বলল, 'কি ঘটেছে আমরা জানি না। আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমাদের ওপর দিয়ে হাজার হাজার ঘোড়া উট ও খচ্চরকে ছুটে যেতে দেখলাম। আমাদের অনেকে

সেইসব বোবা জানোয়ারের পায়ের তলে পিষে মারা পড়ল। কেউ হয়তো আমাদের পশুগুলোর বাঁধন কেটে দিয়েছিল। সেগুলো ছুটাছুটি করে আমাদের দলিত মথিত করছিল। প্রাণ ভয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি।'

এদিকে চারজন মুসলিম মেয়েই বেরিয়ে এলো তাদের তাবু থেকে। খৃষ্টান সৈন্যদের নিজেদেরই তখন মরণ দশা। ফলে বন্দী মেয়েরা কে কোথায় যাচ্ছে সেদিকে নজর দেয়ার মত অবস্থা তাদের ছিল না, কেউ তাদের দিকে তাকালোও না।

মেয়েরা ছুটে গেল মুসলিম ফৌজের কাছে। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, 'সম্রাট বিলডন এদিকে। তোমরা আমাদের কথা শোন। বিলডনকে গ্রেফতার করো।'

কিন্তু তখন সেখানে এমন হট্টগোল চলছিল যে, মেয়েদের দিকে নজর দেয়ার মত সময় কারো ছিল না। কেউ তাদের কথা গ্রাহ্য করল না। কেউ শুনতেও পেল না তাদের চিৎকার। অশ্বারোহীরা এত দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছিল যে, তাদের কানে মেয়েদের কথা পৌঁছতেই পারছিল না। এক মেয়ে ছুটে হট্টগোলের ভেতর ঢুকে গেল। মুহূর্তে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অন্য মেয়েদের থেকে।

সে এক অশ্বারোহীর পেছনে ছুটছিল আর চিৎকার করে বলছিল, 'ঘোড়া থামাও, আমার কথা শোন। সম্রাট বিলডন এদিকে।'

কিছু দূর যাওয়ার পর অশ্বারোহীর মনে হলো, কোন মেয়ে চিৎকার করছে। সে ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ার বাগ টেনে ধরল।

ঘোড়ার গতি কমে এলে মেয়েটি ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল ঘোড়ার বাগ। মেয়েটি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, 'আমি মুসলমান। আমার মত আরও তিনজন মুসলিম মেয়ে খৃস্টান সম্রাট বিলডনের বন্দীনী হয়ে ওদের সাথে আছি।'

'কোথায় ওরা? সম্রাট বিলডন কোথায়?'

'আমার সাথে এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তার তাবু।' মেয়েটি বলল।

এই অশ্বারোহী এক কমাণ্ডার ছিল। সে মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে বলল, 'কোন দিকে?'

মেয়েটি দিক নির্দেশ করল। কমাণ্ডার সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

কিছু দূর যাওয়ার পরই সে এক সেনাপতির সামনে পড়ে গেল। ঘোড়া থামিয়ে সে সেনাপতিকে বলল, 'এই মেয়ে সম্রাট বিলডনের ক্যাম্পের খোঁজ জানে। আমি সেখানে যাচ্ছি।'

সেনাপতি বলল, 'দাঁড়াও। সেখানে তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না। সেখানে নিশ্চয়ই তার রক্ষী বাহিনী আছে।'

সেনাপতি মেয়েটির কথা শুনলো। মেয়েটি সম্রাট বিলডনের তাবুর দিক নির্দেশ করে বলল, 'সেখানে আমার মত আরও তিনটি মুসলিম মেয়ে আছে।'

সেনাপতি সম্রাট বিলডনের তাবুতে কমাণ্ডো আক্রমণ চালানোর জন্য দু'টি কমাণ্ডো গ্রুপকে সঙ্গে দিলেন তার। কমাণ্ডারের নেতৃত্বে এই বাহিনী অনতিবিলম্বে বিলডনের তাবুর

দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এবং দ্রুত সেখানে গিয়ে পৌঁছল।
তারা বিলডনের তাবু অবরোধ করে দাঁড়াল। কমাণ্ডার সম্রাট বিলডনকে চ্যালেঞ্জ করলো, তার ক্যাম্পে আগুন লাগানোর হুমকি দিল। কিন্তু কেউ তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না, কেউ তার হুমকীর কোন জবাবও দিল না।
কমাণ্ডার দুই সৈন্যকে তাবুতে ঢুকার হুকুম দিল। তারা তাবুতে ঢুকে দেখতে পেল, বিলডন সেখানে নেই। তার বডিগার্ডরাও কেউ নেই যে, অস্ত্র সমর্পণ করতে আসবে।
তারা আশপাশের তাবুগুলোতে তল্লাশী চালিয়ে কিছু মেয়ে, সেই মুসলিম মেয়ে তিনটি এবং কয়েকজন চাকর-বাকর ও রক্ষীর সন্ধান পেল। কমাণ্ডার তাদের সকলকেই গ্রেফতার করে সেনাপতির সামনে হাজির করল।
বন্দীদের কাছে বিলডন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো সেনাপতি, কিন্তু কেউ তার হদিস বলতে পারলো না।
বিলডন ভয় পেয়ে ততক্ষণে পালিয়ে গেছেন। ঘুম থেকে জেগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এটা মুসলিম কমাণ্ডো বাহিনীর কাজ। এ অবস্থায় তার করার কিছুই ছিল না। তিনি যখন দেখলেন, তার বাহিনী কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে কেবল চিৎকার ও ছুটাছুটি করছে, তখনই তিনি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তার রক্ষী বাহিনী নিয়ে চুপিসারে সেখান থেকে সটকে পড়লেন। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরই তিনি এক কমাণ্ডো গ্রুপের সামনে পড়ে গেলেন। এই গ্রুপের দায়িত্ব ছিল, কেউ এ পথে পালিয়ে

যেতে চাইলে তাকে বাঁধা দান করা।
সম্রাট বিলডন এই বাহিনীর সামনে পড়ে বুঝতে পারলেন, মুসলিম বাহিনী তাদের পালাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি আর সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি আবার তার ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরক্ষীরাও ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল।
তিনি তার ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, এ সময় তার এক পলাতক অশ্বারোহী সামনে পড়ে গেল। সেই অশ্বারোহী তাকে বললো, 'আপনি অন্য কোথাও চলে যান, ক্যাম্পে আর যাবেন না। কারণ সেখানে মুসলমান সৈন্যরা পৌঁছে গেছে।'
বিলডন সেখান থেকেই ঘোড়ার গতি আবার অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।
যে অশ্বারোহী বাহিনী এতক্ষণ ক্রুসেড বাহিনীর একাংশের ওপর প্রলয়কাণ্ড ঘটাচ্ছিল, মুহূর্তে তারা সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। একটু পর একই রকম ডাক-চিৎকার শুরু হলো ক্রুসেড বাহিনীর অপর অংশ থেকে। সেখানেও সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রথমে তকিউদ্দিনের পদাতিক বাহিনী ও পরে অশ্বারোহী বাহিনী।
তকিউদ্দিনের পদাতিক বাহিনী এই বাহিনীর ওপর আঘাত হানতে এসে তুমুল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। কারণ তখন তারা জেনে গিয়েছিল, মুসলিম বাহিনী রাতের অন্ধকার অগ্রাহ্য করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যদি সময় মতো

অশ্বারোহী বাহিনী এসে না পড়তো, তবে পদাতিক বাহিনী বড় রকমের বেকায়দায় পড়ে যেতো। এরই মধ্যে অনেকে শহীদ হয়ে গিয়েছিল, অনেকে আহত হয়েছিল।

সারা রাত তকিউদ্দিনের বাহিনী 'আঘাত হানো আর পালাও!' যুদ্ধে লিপ্ত রইল। যখন ভোর হলো, দেখা গেল, হিম্মত দুর্গের আশপাশে ছড়িয়ে আছে খৃস্টানদের অগণিত লাশ। চারদিকে লাল রক্তের ছড়াছড়ি। বহু আহত সৈন্য পালাতে না পেরে মরণ যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে।

এসব লাশ ও আহত সৈন্যদের মধ্যে তকিউদ্দিনের মুসলিম মুজাহিদরাও ছিল। খৃস্টানদের উট, ঘোড়া ও খচ্চরগুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে চড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সেখানে বিলডনও ছিল না, তার সেনাবাহিনী বা বডিগার্ডরাও ছিল না। ক্রুসেড বাহিনী তাদের বিস্তর রসদপত্র ফেলে পালিয়ে গেছে।

তকিউদ্দিন তার বাহিনীকে আদেশ দিলেন, আহতদের সেবা ও চিকিৎসা করতে। আরেকটি দলকে হুকুম দিলেন, সকল মৃত ব্যক্তি ও শহীদ সৈন্যদের দাফনের ব্যবস্থা করতে। অন্য একটি দলকে বললেন, 'দুশমনের ফেলে যাওয়া মাল সামান সব এক জায়গায় জমা করো। তাদের যে পশুগুলো বেওয়ারিশ অবস্থায় মরুভূমিতে ও পাহাড়ের আশেপাশে চড়ে বেড়াচ্ছে, সেগুলো ধরে এনে বেঁধে রাখো।'

০

তকিউদ্দিনের এ আক্রমণ ছিল অসাধারণ সাহস ও বীরত্বপূর্ণ

কাজ। যুদ্ধের কলা-কৌশল, আবেগ ও জোশের দিক থেকে এ আক্রমণ ছিল অনন্য ও অসাধারণ। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলাফল বা লাভ-ক্ষতির দিক বিবেচনা করে ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, শত্রু বাহিনী যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছিল, সে সময় যদি তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সামরিক শক্তি একেবারে ধ্বংস করে দেয়া যেতো তবেই এ সফলতা পূর্ণাঙ্গ হতো।

তা ছাড়া তকিউদ্দিন যদি আরেকটু সাহসিকতা প্রদর্শন করে অধিকৃত এলাকায় অগ্রাভিযান চালাতো এবং নিজস্ব বন্দীদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করতো তবে ক্রুসেড বাহিনীর সা'ধ্য ছিল না তাদের প্রতিরোধ করে।

কিন্তু সুলতান তকিউদ্দিন এ ঝুঁকি নিতে চাননি। কারণ তার হাতে পর্যাপ্ত সৈন্য ছিল না। যেটুকু বিজয় অর্জিত হয়েছে সেটুকু হাতছাড়া হয়ে যাক, তা তিনি চাননি। কমাণ্ডো হামলা করে আঁধার রাতে ঘুমন্ত বিশাল বাহিনীকে লণ্ডভণ্ড করা আর বিশাল এলাকায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এক কথা নয়। কিন্তু এটুকু বিজয়ও কম সফলতা ছিল না। রমলার পরাজয় মুসলমান সৈন্যদের মনে যে অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল এই বিজয়ের ফলে তা দূর হয়ে গেল। তারা আবার নতুন প্রেরণা ও আবেগ নিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল। আইয়ুবীর পরাজয় এবং খৃস্টানদের বিশাল বহর দেখে জনমনে এবং সৈন্যদের মধ্যে যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল এই বিজয় তা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল। খৃস্টানরা মুসলমনদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী এই

ধারনার পরিবর্তে বিজয়ের মালিক যে আল্লাহ এই ধারনা আবার তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এই আস্থা ফিরে এলো যে, এখন তারা খৃস্টানদেরকে যে কোন ময়দানে পরাজিত করতে পারবে। এখন প্রয়োজন সৈন্য বাড়ানো।

খৃস্টানরা এ যুদ্ধে বড় রকমের ধাক্কা খেল। তারা ভেবেছিল, আইয়ুবী যখন পরাজিত হয়েছে তখন তাদের অগ্রগতি আর কোথাও বাঁধাপ্রাপ্ত হবে না। তারা স্রোতের মত সমগ্র মুসলিম সালতানাতে খৃস্টবাদের বন্যা বইয়ে দেবে। অধিকৃত অঞ্চলগুলো ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে নিজেদের মধ্যে। আর এ বাটোয়ারার মূলনীতি হবে, যে যতটুকু অঞ্চল দখল করতে পারবে, সেটুকু তার অঞ্চল বলে গণ্য হবে।

কিন্তু এই ব্যর্থতা তাদের অগ্রাভিযানের গতি থামিয়ে দিল। খৃস্টান সৈন্যরা বিজয় যতটা সহজ ভেবেছিল, তত তেলতেলে আর রইল না। মুসলমানরা যুদ্ধের সময় অলৌকিক ও কুদরতি সাহায্য পায় বলে খৃস্টান সৈন্যদের মনে সব সময়ই যে ভীতি কাজ করতো, সেই ভীতিটা আবার তাদের পেয়ে বসল। সবচে বড় কথা হল, যে হিম্মত দুর্গ নিয়ে এ লড়াই হলো, সে দুর্গ মুসলমানদের হাতেই রয়ে গেল। খৃস্টান বাহিনীকে এগুতে হলে এ দুর্গের পতন ঘটিয়েই সামনে এগুতে হবে। কিন্তু এ দুর্গ দখল করা কতটা কঠিন, আর কেউ না হলেও খৃস্টান সম্রাট বিলডন তা হাড়ে হাড়ে টের পেল।

যুদ্ধের পর দিন। সুলতান তকিউদ্দিন তার হেডকোয়ার্টারে বসে আফসোস করছিলেন। তার সেনাপতিদের অবস্থাও ছিল উত্তেজনা ও আবেগে পরিপূর্ণ। তকিউদ্দিন বলছিলেন, 'যদি আমার কাছে আরও কিছু সৈন্য থাকতো, তবে কমাণ্ডো আক্রমণের এই সফলতার পর আরো বড় ধরনের বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারতাম। সম্রাট বিলডন তার বাহিনীর কিছুই ফেরত নিতে পারতেন না। হয় তারা মারা যেত, নয় বন্দী হতো।'

একই রকমের আক্ষেপ ধ্বনিত হচ্ছিল তার সেনা অফিসারদের কণ্ঠ থেকেও।

তকিউদ্দিন তার কাতেবকে ডাকালেন। তিনি তার বড় ভাই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে চিঠি লিখতে বসলেন। তিনি লিখলেন:

'শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, মিশরের সম্মানিত সুলতান!'

'আল্লাহ আপনাকে ইসলামী সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য আরো দীর্ঘ কাল বাঁচিয়ে রাখুন। আমি এই আশা নিয়েই চিঠি লিখছি, আপনি সুস্থ্য ও মঙ্গল মতেই কায়রো পৌঁছে গেছেন। প্রথমে গুজব শুনেছিলাম, আপনি নাকি শহীদ হয়ে গেছেন। পরে জানতে পারলাম, আপনি সামান্য আহত হয়েছেন। আমি ও আমার সেনাপতিগণ আপনার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলাম। আপনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাসেদ মারফত আপনার জীবিত ও সুস্থ্য থাকার খবর আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে আমরা

কৃতজ্ঞ।
আমি আশা রাখি, আপনি রমলার আকস্মিক পরাজয়ের ব্যথা অন্তরে লালন করে নিজেকে কষ্ট দেবেন না। আমরা ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো। হারানো এলাকা আবার উদ্ধার করবো এবং বায়তুল মুকাদ্দাসও আমরা মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।
আপনি পরাজয়ের কারণগুলো অবশ্যই খুঁটিয়ে দেখছেন। আমি এ ক্রটি সৈন্যদের ওপর চাপাতে চাই না। আমাদের পরাজয় দেখার জন্য আমাদের ভাইয়েরা যেদিন থেকে দলবদ্ধ হয়েছিল, সেদিন থেকে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রধারণ করেছিল। যখন দুই ভাই পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন শত্রুরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও দরদ দেখিয়ে গোপনে পরস্পরকে উত্তেজিত করতে থাকে।
আমাদের ভাইদেরকে গদি ও রাজ্যের নেশা অন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের যে অর্থ ও শক্তি ইসলামী সাম্রাজ্যের মজবুতির জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল, সে সব গৃহযুদ্ধ করে আমরা শেষ করে ফেলেছি। আমাদের বিশাল সামরিক শক্তি এবং পরীক্ষিত সৈন্যরা এই যুদ্ধে নিহত বা আহত হয়ে আমাদের দুর্বল করে দিয়েছে।
বিদ্রোহীদের সৈন্য বাহিনী এই ইসলামী খেলাফতেরই সৈন্য ছিল। এই সেনাবাহিনী শুধু এ জন্যই নষ্ট হয়ে গেল যে, জাতির কিছু লোক ক্ষমতা ও গদীর লোভে নিজেদের বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। তারা ইসলামী খেলাফত

ও হুকুমতকে নিজ নিজ অংশে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। তাদের পরস্পরের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, লোভের বশে তারা নিজের পায়ে কুড়াল মারতেও প্রস্তুত।

এখন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, জাতি যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে না থাকে। মাজহাবী মতপার্থক্যই কি কম বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে? রাজত্ব ভাগ-বাটোয়ারার মত জাতিকেও বিভক্ত রাখার অপচেষ্টা চলছে। আমি মনে করি, এই দলাদলিই আমাদের পরাজয়ের কারণ। দলাদলি করে গুটিকয় লোক, কিন্তু এর শাস্তি ভোগ করতে হয় সমগ্র জাতিকে। এ কথা এখন আমাদের সেনাপতি ও সামরিক অফিসাররা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। জাতির প্রতিটি নাগরিককে আজ এ কথা বুঝাতে হবে।

গৃহযুদ্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে সেই শূন্যতা আমরা পূরণ করেছি নতুন সৈন্য ভর্তি করে। অনভিজ্ঞ সৈন্যদেরকে সমরক্ষেত্রে পাঠানোর কারণেই আমাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হলো। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া সমস্ত সৈন্যই নতুন ও আনাড়ী ছিল। তাদেরকে শক্তিতে পরিণত করতে হলে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে, নিশ্চয়ই আপনি তা স্বীকার করবেন।

আমি ও আমার সেনাপতিগণ রমলার পরাজয়ের পরপরই প্রমাণ করে দিয়েছি, আমাদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়নি। আপনি যে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য আমার কমাণ্ডে রেখে

গিয়েছিলেন; তারা খৃস্টান বাহিনীকে হিম্মত দূর্গে ঢুকতে দেয়নি। হিম্মত দুর্গের বাইরেই আমরা তাদের কবর রচনা করেছি। অন্ধকার তাদের সহায় হয়েছিল, নইলে তাদের কাউকে আমরা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতাম না।

আপনি আমাকে ও আমার বাহিনীকে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে সংরক্ষিত রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এমন আকস্মিকভাবে বদলে গেল যে, আপনার আদেশ নেয়ার সুযোগও হলো না। সমরাঙ্গণে কি হচ্ছে, সেখানে আমার প্রয়োজন আছে কি না, আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, এসব কিছু জানার আগেই আপনার পরাজয়ের খবর আমার কাছে পৌঁছে যায়।

আপনাকে সাহায্য করার জন্য তখনি আমি বাহিনী নিয়ে রওনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার রেখে যাওয়া অভিজ্ঞ অফিসাররা আমাকে থামিয়ে দেয়। তারা আমাকে উত্তেজিত হয়ে আবেগের বশে কোন সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে। এ জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে অশেষ উপকার করেছে।

তাদের পরামর্শেই আমি আমার সমস্ত আবেগ ও উত্তেজনা প্রশমিত করে নিলাম। তারপর ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করে দেখলাম, হিম্মতের অবস্থান টিকিয়ে রাখাই এ মুহূর্তে সবচে জরুরী। আমি আমার সৈন্য দলকে সেভাবেই পরিচালনা করলাম।

আপনার পরাজয়ের খবর আমার বাহিনীকেও ভীষণভাবে

আহত করেছিল। আমি আল্লাহর দরবারে তাদের মনোবল ও সাহসের জন্য প্রার্থনা করলাম। দুশমনের প্রতিটি তৎপরতা জানার জন্য আমি গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলাম। এক গোয়েন্দা আমাকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানালো। সে বলল, সম্রাট বিলডন তার সেনাবাহিনী নিয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। সাথে সাথে আমি আপনার কথা স্মরণ করলাম। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, যদি আমার ভাই এ পরিস্থিতিতে পড়তেন তবে কি করতেন? এ প্রশ্নের যে উত্তর পেলাম সেভাবেই আমি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম।

বিলডন দুর্গ অবরোধ করল। সে ধরেই নিল, আমার সমস্ত বাহিনী হিম্মত দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছে। বিলডনের বাহিনী আমাকে সদলবলে বন্দী করার জন্য হিম্মত দুর্গ অবরোধ করে বসে রইল।

আমি আপনার যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে আমার বাহিনীর মূল অংশ আগেই দুর্গ থেকে বের করে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখলাম। কেল্লাধিপতিকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে আমি এসে যোগ দিলাম মূল বাহিনীর সাথে। আমার আশা আল্লাহ পূরণ করলেন। সম্রাট বিলডনের সৈন্য সংখ্যা আমার বাহিনীর দশগুণেরও বেশী ছিল। রাতের বেলা আমাদের জানবাজ সৈন্যরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বীরের মত কমাণ্ডো আক্রমণ চালালো। নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের ত্যাগ, কোরবানী ও সাহসিকতার বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার নেই। শুধু এতটুকু বলবো, জয়-পরাজয়ের দায়িত্ব আল্লাহর

হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি কোন বাহিনী তার সমগ্র শক্তি ময়দানে হাজির করতে পারে তবে আল্লাহ কখনো তাদের নিরাশ করেন না, এই বিশ্বাসের বাস্তবতা আমি সচক্ষে দেখেছি।

যদি আপনি সে দৃশ্য দেখতেন, যে দৃশ্য আমরা সেদিন সকালে সূর্যের আলোয় দেখেছি, তবে আপনার পরাজয়ের বেদনা ও গ্লানি সত্যি ভুলে যেতেন। আমার সবচেয়ে আফসোস এই, বিলডন আমার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তাকে আমি ধরতে পারিনি।

আমি এখন পাহাড়ের এক চূড়ায় বসে কাতিব দিয়ে চিঠি লিখাচ্ছি। এখান থেকে হিম্মত দুর্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে এখনও মিশরের ইসলামী পতাকা পতপত করে উড়ছে।

কেল্লার আশেপাশে ক্রুসেড সৈন্যদের লাশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। আমি তাদের দাফন করার কথা বললেও তা শেষ করতে আরো দু'তিন দিন লেগে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত লাশগুলো সেখানে থাকবে কিনা আমি বলতে পারি না। কারণ হাজার হাজার শকুন আকাশে উড়ছে। শকুনেরা ভীড় করে লাশ খেতে শুরু করেছে। কোন কোন স্থান থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। এসব আগুন গত রাতে আমার কমাণ্ডো বাহিনী লাগিয়েছিল। বিলডনের কত সৈন্য মারা গেছে আর কত সৈন্য পালিয়ে যেতে পেরেছে, এখনও আমি সে শুমার করতে পারিনি।

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, বিলডন এখনি কোন প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালানোর কথা চিন্তা করতে পারবে

না। কিন্তু তাই বলে আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় নেই। আমরা পরিপূর্ণ সতর্কতা ও প্রস্তুতি নিয়েই এখানে অপেক্ষা করছি।

আমার কাছে এখন যে পরিমাণ সৈন্য আছে আর এই পরিমাণ সৈন্য থাকলে আমি পলায়নপর ক্রুসেডদের পিছু তাড়া করতাম। আর তা করতে পারলে রমলাসহ যেটুকু অঞ্চল খৃস্টানরা দখল করে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দিয়ে তবেই তারা নিজেদের জান বাঁচাতে পারতো। আর কিছু সৈন্য থাকলেই পরাজয়কে আমি বিজয়ে রূপান্তর করে দিতাম।

আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমার সেনাপতি, কমাণ্ডার ও সেনাবাহিনীর সমস্ত যোদ্ধাদের মনে যুদ্ধ করার বলিষ্ঠ আগ্রহ ও মনোবল রয়েছে। আমি এটাও জানি, আপনি নিশ্চিন্তে ও আরামে বসে নেই। নিশ্চয়ই আপনি নতুন সৈন্য ভর্তি ও তাদের ট্রেনিংয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

আপনি সেই ব্যস্ততা নিয়েই প্রশান্ত মনে প্রস্তুতি নিতে থাকুন। আমি সুযোগ মত কমাণ্ডো লড়াই অব্যাহত রাখবো। শত্রুদের কখনও আরামে বসে থাকতে দেবো না। এই সৈন্য নিয়ে হয়তো কোন অঞ্চল অধিকার করে ধরে রাখতে পারবো না, কিন্তু আপনি যেন প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ পান সে ব্যবস্থা আমি করবো।

আমি দামেশকে ভাই শামসুদ্দিনকেও চিঠি পাঠিয়েছি, তিনি যেন কিছু সৈন্য ও সামানপত্র পাঠান। হলবে আল-মালেকুস সালেহকেও সংবাদ পাঠিয়েছি, তার সাথে আপনার যে চুক্তি হয়েছে সে চুক্তি অনুসারে সে যেন আমাকে সাহায্য পাঠায়।

আমি আপনাকে আল্লাহর উপর ভরসা করেই এ কথা বলতে চাই, আপনি আমার সম্পর্কে কোন চিন্তা করবেন না। আমি ও আমার সঙ্গী সেনাপতিগণ আপনার মঙ্গল ও তৎপরতা সম্পর্কে জানার জন্য অধীর আগ্রহে চেয়ে আছি। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা তারই করুণার ছায়া চাচ্ছি। কারণ আমরা জানি, আমাদের সকলকে একদিন তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

আপনার স্নেহের ভাই তকিউদ্দিন।

তকিউদ্দিন চিঠিতে দস্তখত করে কাসেদের হাতে দিয়ে দ্রুত তা কায়রো পৌঁছে দেয়ার হুকুম দিলেন। কাসেদ সে চিঠি নিয়ে ছুটল কায়রোর পথে।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-২১

ধাপ্পাবাজ

ক্রুসেড-২০.
পাল্টা ধাওয়া
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন